সুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

মাহমুদুর রহমান

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

মাহমুদুর রহমান

কাশবন প্রকাশন, ঢাকা

www.pathagar.com

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

মাহমুদুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রথম পুনর্মুদ্রণ
২২ আষাঢ় ১৪২১, ৬ জুলাই ২০১৪

প্রকাশক
আমিনুল ইসলাম
কাশবন প্রকাশন
২৫৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা ১১০০
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৩০৯০৮
e-mail : kashban@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব
ফিরোজা মাহমুদ

পরিবেশক
উত্তরণ : বাংলাবাজার, ঢাকা
পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা
বাতিঘর : প্রেসক্লাব ভবন, চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ
আসিফুল হুদা

বর্ণবিন্যাস
মাইক্রোটেক কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
নিউ এস আর প্রিন্টিং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ২৯০.০০ টাকা মাত্র

Goomrajjey Prottabartan : (A collection of socio-political columns) by Mahmudur Rahman, Published by : Kashban Prokashan, 254 Nawabpur Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Price Tk. 290.00 US. Dollar 10 only.

ISBN : 978-984-8907-56-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমার সাংবাদিকতার শিক্ষক
মরহুম আতাউস সামাদ
ও
ফ্যাসিবাদের হাতে নির্যাতিত সকল সাংবাদিককে

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমানের
অন্যান্য গ্রন্থ

জাতির পিতা ও অন্যান্য
ফুলবাড়ীর রাজনীতি
১/১১ থেকে ডিজিটাল
নবরূপে বাকশাল
কার মান কখন যায়
জেল থেকে জেলে
জয় আসলে ভারতের
দুর্নীতিমুক্ত দেশ : সমাজচিন্তকদের ভাবনা (সম্পাদনা)

www.pathagar.com

প্রাককথন

আজ বুধবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২। আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের অফিসে একপ্রকার গৃহবন্দি হয়ে থাকার এক সপ্তাহ পূর্ণ হলো। আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের থেকে সরকারের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছে। ক্ষমতাসীন মহলের শীর্ষ নীতিনির্ধারকরা চাইছেন ১১ তলার অফিস ছেড়ে আমি নিচে নেমে যাই, আর সাদা পোশাকের পুলিশ বিএসইসি ভবনের চত্বর অথবা সামনের রাজপথ থেকে আমাকে গ্রেফতার করুক। ২০১০ সালের মতো তারা বোধহয় শত শত পুলিশ পাঠিয়ে আর পত্রিকা অফিসে তাণ্ডব চালাতে চায় না।

সে ক্ষেত্রে আমার অবস্থান পরিষ্কার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে গ্রেফতার হতে হলে আমি পত্রিকা অফিসে কর্মরত অবস্থা থেকেই হবো। এই সংগ্রামে ব্যক্তিগত লাভালাভের কোনো বিষয় নেই। এদেশের অনেক সম্পাদক দলীয় অবস্থান, পেশাগত ঈর্ষা, ব্যক্তিগত বিরাগ, সাহসের অভাব ইত্যাদি কারণে সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা থেকে যে বিরত থাকছেন, সেটি তাদের সমস্যা। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের স্কাইপ সংলাপ প্রকাশের সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে, ভেবে-চিন্তেই নিয়েছি। আদালত নিয়ে সরকারের ভয়ঙ্কর খেলা ফাঁস করে দেয়ার পরিণতি না বোঝার মতো নির্বোধ আমি নই। অনেকেই হয়তো 'ইয়োর অনার' এবং 'লর্ডশিপ'দের আসল চেহারার এমন প্রমাণ হাতে পেলে মওকা পাওয়া গেছে মনে করে জীবনের মতো সওদা করে নিত।

এই একটি তথ্য চেপে যাওয়ার বিনিময়ে আমিও বাকি জীবন দেশে অথবা বিদেশে বেশ নিরাপদে, আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আর কোনোদিন আয়নার সামনে নিজের মুখোমুখি হতে পারতাম না। একটি দৈনিক পত্রিকাকে হাতিয়ার করে দেশের সাধারণ নাগরিকের বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার যে সংগ্রাম, মাঝপথে তারও অপমৃত্যু ঘটতো। অতএব মানুষের জীবন এবং বিচার বিভাগের মর্যাদা নিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসকদের খেলা প্রকাশ করা ভিন্ন আমার কোনো উপায় ছিল না।

ভরা হাটের মাঝে বেআব্রু হয়ে পড়া মন্ত্রী, বিচারপতির দল এখন ছুটে এসে আমাকে দংশন করতে চাইছে। বাংলাদেশের ষোল কোটি জনগণ তো বটেই, এদের বিষাক্ত দাঁতের ঝিলিক সাত-সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের মানুষরাও দেখতে পাচ্ছেন। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, এবারের লড়াই বাংলাদেশে

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে। আওয়ামী সরকার এবং আদালতের মিলিত আক্রমণে আমার দেশ-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হলে ভবিষ্যতে অন্য কোনো পত্রিকার পক্ষে জনস্বার্থে ঝুঁকি নিয়ে হলেও সত্য প্রকাশের সাহস প্রদর্শন আর সম্ভব হবে না। অপরদিকে আমরা টিকে গেলে গণমাধ্যমের আপসকামী চেহারাটাই পাল্টে যাবে। মূলত কালো টাকার মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেসব মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণ তাদের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। আমি যখন লিখছি, ঠিক তখনই আপিল বিভাগে আমার দেশ-এর ভাগ্যনির্ধারণী সিরিজ মামলার প্রথমটি শুরু হয়েছে। আজকের মতো লেখার টেবিল ছিড়ে ওঠার আগেই হয়তো তার ফলাফল জেনে যাব।

এবারের একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য 'গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে অন্য আলোচনায় চলে গিয়েছিলাম। উপর্যুপরি সাত নির্ঘুম রাত মনকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। ২০১১ সালের মার্চে জেল থেকে মুক্তিলাভের পর আমার যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে বাছাই করা ১৯টি লেখা নিয়ে বইটি সাজিয়েছেন সহকর্মী কবি হাসান হাফিজ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উদীয়মান নেতা ইলিয়াস আলীকে সরকারের কিলিং স্কোয়াড গুম করার সময় আমি বিদেশে চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার চোয়ালে প্রাণঘাতী নয়, তবে জটিল একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। চিকিৎসা সমাপ্ত করে ঢাকায় ফিরে ইলিয়াসের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে যে মন্তব্য প্রতিবেদনটি লিখেছিলাম, তারই শিরোনাম দিয়ে বইটির নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রায় সবগুলো লেখাই মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিষয়ক। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্রের এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতক রূপ আর দেখেনি। সাধারণ নাগরিকদের আতঙ্কিত করার ক্ষেত্রে জেনারেল মইন ও ড. ফখরুদ্দীনের দুই বছর মেয়াদের ছদ্মবেশী সামরিক সরকার হয়তো এদের কাছাকাছি আসতে পারে।

গতকালের এক ঘটনার কথা বলি। সকাল দশটার দিকে প্রতি সপ্তাহের মন্তব্য প্রতিবেদন লেখার কাজে মগ্ন ছিলাম। এক তরুণ সহকর্মী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে দরজায় উঁকি দিয়ে দু'মিনিট সময় চাইল। অনুমতি দিলে তার এক পরিচিত জনের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরটি আমাকে দিল প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই। সরকারের বিশেষ ঘাতক বাহিনী নাকি পরিকল্পনা করেছে, আমাকে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলার। আমি ভরসা দিয়ে তাকে বললাম, এগারো তলায় তো আর গাড়ি চালিয়ে আসতে পারছে না, আপাতত নিশ্চিন্ত হও। ছেলেটি মনে করলো, আমি তার খবরটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি না। বারবার বলতে লাগলো, স্যার খুব বিশ্বস্ত সোর্স থেকে সংবাদটি পেয়েছি। গণতন্ত্রের মানসকন্যার দাবিদার শেখ হাসিনার হিংসার রাজনীতি চর্চার ফলে তার প্রতি জনমনে কতখানি ভীতির

www.pathagar.com

সঞ্চার হলে সাংবাদিক মহলে এ-জাতীয় আলাপ-আলোচনা হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

প্রধানমন্ত্রী এক আজব সরকার চালাচ্ছেন। সারা দেশের লোক আতঙ্কগ্রস্ত, কোথাও কারো নিরাপত্তা নেই। বিদেশে একমাত্র দিল্লি ছাড়া তিনি বন্ধুহীন। ইসলামীক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এতোদিন কেবল তুরস্ক এবং মালয়েশিয়ার সঙ্গে মোটামুটি সুসম্পর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনেকটা হঠাৎ করেই তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্কের ভয়ানক অবনতি হয়েছে। ঢাকা ও আংকারায় রাষ্ট্রদূতদের ফরেন অফিসে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। ঘটনা শেষ পর্যন্ত বহিষ্কার নাটক পর্যন্ত গড়ালেও অবাক হবো না। প্রফেসর ইউনূসকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা সেই কবেই তিক্ত বিচ্ছেদে রূপ নিয়েছে। ইউরোপ নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। ওয়াশিংটনের ইচ্ছার বাইরে তাদের যাওয়ার রেকর্ড নেই।

ঘরে-বাইরে কোণঠাসা প্রধানমন্ত্রী ক্রমেই ক্ষিপ্ত হচ্ছেন। আশঙ্কা হচ্ছে, বইমেলা আসতে আসতে গুমের ঘটনা মহামারীর রূপ নিয়ে ফেলে কিনা। ওদিকে সীমান্তে ভারতীয় দানব বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের অপহরণের রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। সব মিলিয়ে কেমন এক দম বন্ধ করা পরিবেশে আমরা বসবাস করছি। জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত নাগরিক তার দৈনন্দিন কাজ অবশ্য বাধ্য হয়েই করে চলেছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, কারো চেহারায় কোনো আনন্দের প্রকাশ নেই। কেমন যেন রোবটের মতো সকলের চলাফেরা। অথচ বেশ ক'বছর আগে এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, দরিদ্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষগুলো নাকি বিশ্বে সবচেয়ে সুখী। এত কম সময়ে সবকিছু পাল্টে গেল? নাকি আমিই নিরাশাবাদীতে পরিণত হয়েছি! এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করে ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন দেয়নি। তারা জনকল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক, শোষণহীন একটি রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যেই পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার সঙ্গে শেখ হাসিনার গুমরাজ্য সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আমার এ বই বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন 'টিনপট ডিক্টেটর'-এর শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষুদ্র-প্রয়াস মাত্র। আশা করি, যত ক্ষুদ্রই হোক, পাঠকদের মধ্যে একটি অংশ অন্তত জাগ্রত হবেন।

আমার ছয় বছরের লেখালেখি জীবনে 'গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন' সপ্তম বই। এবারের বইমেলায় অবশ্য অষ্টম বই 'জয় আসলে ভারতের'ও প্রকাশিত হলো।

www.pathagar.com

এক-এগারোর ছদ্মবেশী সামরিক শাসন না এলে হয়তো একজন প্রকৌশলীর লেখক হওয়া হতো না। ২০১১ সালের বইমেলার সময় আমি কারাগারে ছিলাম। সে বছর একজন প্রকাশক খুঁজে পেতে আমার স্ত্রী ফিরোজা মাহমুদকে জনে জনে অনুরোধ করতে হয়েছে। অনেক খুঁজে হাসি প্রকাশনীকে পাওয়া গিয়েছিল। ওই বইমেলায় অনেকটা নিষিদ্ধ বইয়ের মতো করে লুকিয়ে পাঠকরা 'নবরূপে বাকশাল' এবং '১/১১ থেকে ডিজিটাল' কিনেছেন। এই সরকারের মেয়াদের শেষ বছরে এসে অবশ্য অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। একুশের বইমেলা আসার অন্তত ছ'মাস আগে থেকেই প্রকাশকরা আমার দেশ অফিসে ভিড় জমিয়েছেন। আমার বই প্রকাশ করতে তারা আর ভীত হচ্ছেন না। আগ্রহী প্রকাশকদের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত কাশবন প্রকাশনের আমিনুল ইসলামকেই এই বইটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছি। এর আগে গত বছর তিনি আমার প্রথম দু'টি বই যথাক্রমে 'জাতির পিতা ও অন্যান্য' এবং 'ফুলবাড়ীর রাজনীতি' পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। বই দু'টি ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এবার তাই 'গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন' ছাপানোর দায়িত্ব প্রথম থেকেই কাশবনকে দিলাম।

বরাবরের মতোই সহকর্মী কবি হাসান হাফিজ পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এবং আর এক সহকর্মী, দেশের সেরা কার্টুনিস্ট আসিফুল হুদা প্রচ্ছদ এঁকেছেন। লোকদেখানো কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের ছোট করবো না। অফিসবন্দি অবস্থায় স্ত্রী ফিরোজা মাহমুদ প্রতিদিন ঘর থেকে আহার নিয়ে এসেছেন। আর মা মাহমুদা বেগম একাকী অপেক্ষা করেছেন একমাত্র সন্তানের ঘরে ফেরার আশায়। এই দুই নারীকে ধন্যবাদ জানানো বাহুল্যমাত্র। সারাজীবনের একগুঁয়ে আমাকে আগলে রেখেছেন দু'জনা মিলে। আমার অন্যান্য বইয়ের মতো 'গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন'ও পাঠকের মনোযোগ কাড়তে পারলে সবার কষ্ট সার্থক হবে। সর্বশেষ আমার দেশ-এর সহকর্মীদের প্রতি ভালোবাসা না জানালে ঋণী থেকে যাব। তারা পালা করে ২৪ ঘণ্টা আমাকে পাহারা দিয়ে চলেছেন। আমার মতো এমন বন্ধুভাগ্য ক'জনারই বা হয়!

মাহমুদুর রহমান
২৮ ডিসেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সরকারি দলের ঢাকা দখল / ১৩
সাগর-রুনিকে দ্বিতীয়বার খুন / ২০
গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন / ২৭
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য / ৩৫
বেপরোয়া ফ্যাসিবাদের পুলিশি অ্যাকশন / ৪৩
গণতন্ত্রবিনাশী পঞ্চদশ সংশোধনী / ৫২
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খল পুলিশ / ৬০
আগ্রাসী দলীয়করণের অশুভ পরিণতি / ৬৬
স্বজন গুম হলে প্রতিবাদ করা যাবে না / ৭৪
নির্বাচনী ভাবনা / ৮০
প্রধানমন্ত্রীর লন্ডন বার্তা / ৮৭
মধ্যবিত্তের দিনযাপন / ৯৪
বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : প্রচারণা ও বাস্তবতা / ১০১
আইন সবার জন্য সমান নয় / ১১০
বিভক্ত রায় : বাংলাদেশে অশনি সঙ্কেত / ১১৭
জনদুর্ভোগে বিরোধী দলের নীরবতা / ১২৫
শ্রদ্ধাঞ্জলি : আমার পড়ন্ত বেলার শিক্ষক চলে গেলেন / ১৩৩
জঙ্গিতত্ত্ব ফেরি করে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি / ১৩৮
গণতান্ত্রিক শাসনের বিকল্প নেই / ১৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সরকারি দলের ঢাকা দখল

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছে, বিএনপিকে আগামী ১২ মার্চের কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না। ওইদিনের আগেই সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা ঢাকা শহর দখল করে নেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আমরা দখলদার বাহিনী নামে অভিহিত করতাম। ইরাক এবং আফগানিস্তানেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সেনাজোটকে বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ দখলদার সেনারূপেই বিবেচনা করে। কাশ্মীর, সিকিম, নাগাল্যান্ড, মিজোরামেও স্থানীয় জনগণের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মান সম্ভবত দখলদারের ঊর্ধ্বে নয়।

কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের সেই রাষ্ট্রের রাজধানী দখলের উদ্ভট বাসনা হতে পারে, সেটি জানা ছিল না। অবশ্য, দেশে গৃহযুদ্ধ চললে তখন হয়তো দখল-পুনর্দখলের প্রশ্ন উঠতে পারে। আওয়ামী লীগের ঢাকা দখলের এই ঘোষণাও দেশে গৃহযুদ্ধের কোনো আলামত কিনা, সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দলবলই ভালো বলতে পারবেন। মহানগর আওয়ামী লীগের ঢাকা দখলের ঘোষণা দেয়ার দিনেই প্রধানমন্ত্রী অন্য একটি অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারির বিএনপির গণমিছিলে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও রাজশাহীতে পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে পাঁচজন বিএনপি-জামায়াত কর্মী ও সাধারণ ভ্যান চালক নিহত হওয়ায় কোনোরকম দুঃখ প্রকাশের পরিবর্তে উল্টো এই ট্র্যাজেডির জন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দায়ী করেছেন।

বর্তমান সরকার প্রধান ও তার তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীদের অভিমত অনুযায়ী অপশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের যে কোনো ধরনের প্রতিবাদই অপরাধ। হরতাল করলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রোডমার্চ করলে জ্বালানি তেল পোড়ার কারণে জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটে, গণমিছিল করলে রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়, মানববন্ধন করলে পথচারীদের হাঁটার পথ রুদ্ধ হয়, জনসভা করার জন্য পল্টন ময়দান তো দূরের কথা, মুক্তাঙ্গন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এরপরও বাংলাদেশ নাকি গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা শাসিত হচ্ছে! আসল কথা হলো, ভয়াবহ

www.pathagar.com

অপশাসনের অবধারিত প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতাসীনরা এখন জনগণকে রীতিমত ভয় পেতে শুরু করেছেন। জনগণ যাতে সংঘবদ্ধ হতে না পারে, সে কারণেই বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পুলিশ এবং দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী মাঠে নামিয়ে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

অপরদিকে, গণমাধ্যমকেও নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে, যাতে সরকারি দলের অপকর্ম সম্পর্কে দেশবাসীকে যথাসম্ভব অন্ধকারে রাখা যায়। সংবাদ মাধ্যমের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার ব্যাপারটি অবশ্য আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশ্বব্যাপী স্বাধীন সাংবাদিকতার বিষয়ে পর্যবেক্ষণকারী প্যারিসভিত্তিক সংগঠন 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' তাদের ২০১১ সালের প্রতিবেদনে গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বাংলাদেশের ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় ৩ ধাপ এবং বর্তমান সরকারের ৩ বছরে সর্বমোট ৮ ধাপ পিছিয়েছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ১২১ নম্বর অবস্থান ২০১১ তে নেমেছে ১২৯ নম্বরে। সংগঠনটি তাদের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১১-১২ শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা অব্যাহতভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গণমাধ্যমকে আক্রমণ ও বাধাগ্রস্ত করে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দলটি তাদের ২০০৮ সালের দিনবদলের ইশতেহারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল;

দিনবদলের সনদ

১৯. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহ

১৯.১ সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে। জাতীয়ভিত্তিক ছাড়াও স্থানীয়ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৯.২ সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

১৯.৩ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে।

সরকারের তিন বছরে জনগণকে ২০০৮ সালে নির্বাচনী প্রচারে প্রদত্ত অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো গণমাধ্যম সংক্রান্ত উদ্ধৃত প্রতিশ্রুতিও অবলীলায় ভঙ্গ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ঢাকা দখলের উস্কানিমূলক ঘোষণা একটি গণবিচ্ছিন্ন সরকারের আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশ রূপেই সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। এই অসাড় হুমকির মাধ্যমেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অন্তত মানসিকভাবে রাজধানীর ওপর মহাজোট সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, শেয়ারবাজার লুণ্ঠন, অর্থনীতির বেহাল দশা এবং নতজানু পররাষ্ট্রনীতি জনগণকে সরকারের প্রতি প্রচণ্ড রকম বিরূপ করে তুলেছে। মইন-ফখরুদ্দীন আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্যে দিশেহারা জনগণ আওয়ামী লীগের ১০ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ, বিনে পয়সায় সার প্রদান, ইত্যাকার অবাস্তব প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে দলবেঁধে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য-পণ্যের মূল্য হ্রাস এবং ২০০৮ ও ২০০৯ সালে উপর্যুপরি দু'বছর দেশে ফসল ভালো হওয়ায় মহাজোটের ক্ষমতা লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশীয় বাজারে পণ্যমূল্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকায় সরকারের অন্যান্য অপকর্মের দিকে জনগণ তখন পর্যন্ত তেমন একটা দৃষ্টিপাত করেনি। সরকারের প্রথম দু'বছরের অপশাসন, অপচয়, অদক্ষতা এবং দুর্নীতির ফলে দেশীয় কৃষিপণ্যের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাজেটে টান পড়তে শুরু করে। দেশের অর্থনীতি সঠিকভাবে পরিচালনায় সরকারের অমার্জনীয় ব্যর্থতার ফলে তৃতীয় বছরে গিয়ে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক অতিক্রম করলে বিশ্বের সব ফ্যাসিবাদী শাসকের মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সর্বাত্মক নিপীড়নের পথ বেছে নেন, যা দিনে দিনে তীব্র হয়েছে।

শেয়ারবাজারে সরকার প্রধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লোকজন বাজার কারসাজির মাধ্যমে জনগণকে ১৯৯৬ সালের পর দ্বিতীয়বার সর্বস্বান্ত করায় জনমনে ক্ষোভের পরিমাণ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে এলে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিবর্তে উপরের নির্দেশে পুলিশি অ্যাকশন আরম্ভ হয়েছে। পুলিশ রাস্তা থেকে বিক্ষোভকারীদের ধরে থানায় নিয়ে তাদের ওপর থার্ড ডিগ্রি নির্যাতন চালাচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে পুঁজি হারানো নাগরিকের আত্মহত্যার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটলেও অদ্যাবধি নীতিনির্ধারকরা নির্বিকার থেকেছেন। তোফায়েল আহমেদের মতো মন্ত্রিত্ব না পাওয়া সরকারি দলের সিনিয়র সদস্যরা সংসদে মাঝেমধ্যে হইচই করলেও তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। সরকার প্রধান এবং অন্যান্য মন্ত্রী চিহ্নিত লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে এখানেও বিরোধী দলের ষড়যন্ত্রের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজেও সর্বস্ব হারানো ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সূচকের আর পতন হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিন বছরে সার্বিক অর্থনীতিরও মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতি বছর রেকর্ড সৃষ্টিকারী অতিকায় বাজেটের নামে দুর্নীতি ও অপচয়ের মহোৎসব চললেও দেশের কোথাও দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো উন্নয়নের চিহ্ন নেই। রফতানি প্রবৃদ্ধি আগের চেয়ে হ্রাস পেলেও আমদানির বছরওয়ারি বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফলে, বাণিজ্য ঘাটতি আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এদিকে, শেয়ারবাজারের লুণ্ঠিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশের বিভিন্ন গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি এবং দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ মুদ্রা পাচারের যুগল প্রতিক্রিয়ায় টাকার মানের অবমূল্যায়নেরও রেকর্ড গড়তে পেরেছেন অতিকথন প্রিয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ী সংগঠন মুজিববাদী দালাল গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় অর্থনীতি একেবারে বেহাল অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এতদিন ব্যবসায়ী নেতারাও ঠোঁট সেলাই করে নীরবতা পালন করেছেন। সম্ভবত জনরোষের ভয়ে অতি সম্প্রতি সরকারি দলের চিহ্নিত স্তাবক ব্যবসায়ীরা সেই সেলাই খুলতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল(?) সমাজের অধিকাংশ আওয়ামীপন্থী হওয়ায় তারাও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আগের সরকারগুলোর আমলের মতো সরব থাকেননি। চতুর্দিক থেকে এত সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও আবুল মাল আবদুল মুহিত অর্থনীতির দুরবস্থার জন্য বিস্ময়করভাবে অর্থনীতিবিদ এবং গণমাধ্যমকে দোষারোপ করে কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজেকে জনগণের কাছে অধিকতর হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ সরকার বিভিন্ন সময়ে হঠকারিতার কারণে এক সময়ের একচেটিয়া পশ্চিমা সমর্থন হারিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ অকাতরে বিসর্জনের বিনিময়ে ক্রমেই ভারতের কোলে আশ্রয় খুঁজেছে।

বাংলাদেশকে নিরাপত্তাহীন করে আমাদের মাতৃভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশীর মৃগয়াক্ষেত্র বানানোর কাজটি বর্তমান সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ২০০৯ সালের এই ফেব্রুয়ারি মাসেই বিডিআর বিদ্রোহের আবরণে একই সঙ্গে সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে ধ্বংস করে সামরিক বিবেচনায় বাংলাদেশকে পুরোপুরি ভারতের আশ্রিত করে ফেলা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো রকম ঘটনাতেই প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার জন্য ক্রমেই আঞ্চলিক পরাশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। ক'দিন আগে সেনাসদর আনুষ্ঠানিকভাবে এক কথিত রহস্যময় ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের সংবাদ গণমাধ্যমকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির শাসকশ্রেণী যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, সেটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য চরম অবমাননাকর। প্রাথমিকভাবে সেই অভ্যুত্থানকে বায়বীয় 'ধর্মান্ধ' গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালনার অভিযোগ আনা হলেও এখন দেখা যাচ্ছে, সরকারঘনিষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক লোকজনই ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। বর্তমান

www.pathagar.com

শাসকশ্রেণীর মধ্যে কোনো প্রকার আত্মসম্মানবোধ আর অবশিষ্ট যে নেই, সেটি সৈয়দ আশরাফ, দীপু মনি, গওহর রিজভী, মসিউর রহমানদের বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমেই দেশবাসী বুঝতে পেরেছেন। সীমান্তে আমাদের একজন নাগরিককে উলঙ্গ করে বিএসএফ কর্তৃক ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র দেখে সমগ্র দেশবাসী যখন শিউরে উঠেছে, বিদেশের মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠনগুলো নিন্দা প্রকাশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচার পর্যন্ত দাবি করছে, তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ জানাচ্ছেন যে, তার সরকার এই কলঙ্কজনক ঘটনাতেও চিন্তিত নয়। সৈয়দ আশরাফ বিএসএফ-এর অব্যাহত হত্যাযজ্ঞকে তুচ্ছজ্ঞান করে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বৃহত্তর সিলেটসহ সম্পূর্ণ মেঘনা বেসিনের জনপদের অধিবাসীরা টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেও আমাদেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি সংসদে আধিপত্যবাদী ভারতের পক্ষ টেনে বলছেন, ওই বাঁধ নাকি আসামের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত হচ্ছে। এতদিন কিন্তু আমরা শুনে এসেছিলাম শুধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় এই বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের আয়োজন করেছে। এ দেশের সাধারণ মানুষের কথা হলো আসামের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই হোক, কিংবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যেই হোক, বরাক নদীতে বাঁধ নির্মাণ হলে ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশের নাগরিকরাই সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের অনিষ্ট হলে দীপু মনিদের তো কিছু যায়-আসে না। তারা তো আপাদমস্তক বন্ধক দিয়েই দিল্লির কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে গদিতে বসেছেন। দেশের জনগণ চূড়ান্ত পর্যায়ে খেপে উঠলে প্রয়োজনে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সদস্যরা এই দালাল গোষ্ঠীকে নিরাপদ জায়গায় উড়িয়েও হয়তো নিয়ে যাবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে ভিয়েতনামের বাছাই করা দালালদের মার্কিন দূতাবাসের ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করার চিত্র স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী পরাজিত হলে ইয়াহিয়ার দালাল মন্ত্রীরা তৎকালীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল অর্থাৎ আজকের রূপসী বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। সৈয়দ আশরাফ, দীপু মনির মতো করেই আবুল মাল আবদুল মুহিত, গওহর রিজভী এবং মসিউর রহমান গং ভারতকে বিনা শুল্কে করিডোর দেয়ার অতি উৎসাহে সম্পূর্ণ জাতিকে অন্ধকারে রেখে তিতাস নদী ভরাট করে সেই নদীর বুকের ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছে। নিহত তিতাস নদী এবং তীরবর্তী মানুষের কান্না তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। সর্ব প্রকার রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের অপরাধে ইনশাআল্লাহ, একদিন এই পঞ্চম বাহিনীকে সদলবলে বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

www.pathagar.com

আমার ধারণা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তাদের জনসমর্থন হারানোর বিষয়ে সম্যক অবহিত। এই মুহূর্তে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তার ফলাফল কী হতে পারে, সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন যুগান্ত র পত্রিকায় গত সপ্তাহেই ছাপা হয়েছে। সেই সংবাদে দাবি করা হয়েছে যে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পরিচালিত জনমত জরিপ অনুযায়ী আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ৬৯টি আসনে বিজয়ী হবে। পক্ষান্তরে বিএনপি একাই ১৭০টি আসনে জয়লাভ করবে। যুগান্তরের সম্পাদক মহাজোটের অংশীদার লে. জে. হু. মো. এরশাদের জাতীয় পার্টির মহিলা কোটার একজন সংসদ-সদস্য হওয়ায় পত্রিকাটিকে বিএনপিপন্থী বলার কোনো সুযোগ নেই। শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাতেও যে ধস নেমেছে, সেটিও ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন সাময়িকী 'টাইম' ম্যাগাজিনে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে বিপর্যয়ের বিষয়ে লিখতে গিয়ে নিবন্ধকার নীল চৌধুরী এ দেশে গণঅসন্তোষ বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের শেয়ারবাজারকে পৃথিবীর 'সর্বনিকৃষ্ট' আখ্যা দিয়েছেন। নীল চৌধুরীর প্রতিবেদন পাঠ করে আমার শেখ মুজিবুর রহমানের আমলের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' অপবাদের কথা মনে পড়ে গেল। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সালে ওই নামেই ডেকেছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় পিতা এবং কন্যার 'দক্ষতার' কী চমৎকার সাদৃশ্য!

লন্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'দি ইকনোমিস্ট' কয়েক মাস আগেই তিন কিস্তিতে বাংলাদেশে সুশাসনের চরম অভাবের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এ দেশের বিপর্যয়কর চিত্র এভাবেই একের পর এক উঠে আসার প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনগণের তহবিলের লাখ লাখ পাউন্ড খরচ করে বিদেশের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের বায়বীয় সাফল্যের কথা প্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। উপায়ান্তর খুঁজে না পেয়ে সরকারকে একই কুমিরছানা বারবার দেখানোর মতো করে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে তথাকথিত জঙ্গি তত্ত্ব ফেরি করার পাশাপাশি বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানবিষয়ক আষাঢ়ে গল্পও ফাঁদতে হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সেনা সদরকে ব্যবহার করার মতো আত্মঘাতী কৌশল অবলম্বন সত্ত্বেও দেশ-বিদেশে সরকারের পক্ষে তেমন একটা সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র প্রত্যাশামত দিল্লি থেকে বাংলাদেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা সর্ব অবস্থায় বশংবদ শেখ হাসিনা সরকারের পাশেই থাকবে। তবে দেশের আশি শতাংশ জনগণ ফ্যাসিবাদী সরকারের জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালে দিল্লির পক্ষে সেই জনজোয়ারের বিরুদ্ধে গিয়ে

www.pathagar.com

মহাজোট সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা কতখানি সম্ভব হবে, সেটি আমরা ভবিষ্যতেই দেখতে পাব।

মহানগর আওয়ামী লীগের ঢাকা দখলের ঘোষণা দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের আগ্রাসনের পটভূমি প্রস্তুতের কৌশল কীনা, সে ব্যাপারেও স্বাধীনতাকামী জনগণকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। গত মাসের ২৯ তারিখে বিএনপির পূর্বঘোষিত গণমিছিলের দিনে নগর আওয়ামী লীগ জনসভা ডেকে তাদের অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছিল। ওই তারিখে চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুরে পুলিশ গুলি চালিয়ে বিরোধী দলের পাঁচজন নাগরিককে হত্যা এবং ঢাকার গণমিছিল ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করলেও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রনায়কোচিত আত্মসংযম বজায় রেখেছিলেন। গণমিছিল একদিন পিছিয়ে দিয়ে তিনি কেবল সহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞতারই পরিচয় দেননি, রাজনীতির খেলাতেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন। সরকারের যাবতীয় উস্কানি উপেক্ষা করে আগামী ১২ মার্চ 'ঢাকা চলো' কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারলে তিনি পুনর্বার রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী হবেন।

ক্ষমতাসীন মহল মানসিকভাবে এর মধ্যেই হেরে বসে আছেন বলেই ক্ষমতায় থেকেও নিজ দেশের রাজধানী দখলের উদ্ভট ঘোষণা দিয়ে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারাটি জনগণের কাছে দেখিয়ে ফেলেছেন। মহাজোট সরকার সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, সর্বক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার কারণে তারা গণমানুষের কাছে রাষ্ট্রশাসনের ন্যায্যতা সর্বতোভাবে হারিয়েছে। মেয়াদের বাকি সময়টা রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে নানা রকম কৌশল প্রণয়নে নীতিনির্ধারকদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। সুতরাং, আইন প্রতিমন্ত্রী যতই হুঙ্কার ছাড়ুন না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে আওয়ামী মাঠ কর্মীদের মাঠে খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক দেখতে পাচ্ছি। জানুয়ারির ৩০ তারিখে প্রশাসনের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে বিএনপির গণমিছিলে জনজোয়ার সৃষ্টির বিপরীতে নগর আওয়ামী লীগের সভার দৈন্যদশা দেশের সব গণমাধ্যমে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং, বিরোধ ও সহিংসতা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সরকারপক্ষের বিরোধী দলের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনায় বসলে কেবল দেশটাই বাঁচবে না, আপনারাও হয়তো রক্ষা পাবেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

www.pathagar.com

সাগর-রুনিকে দ্বিতীয়বার খুন

ফ্যাসিবাদী সরকারের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গত তিন বছরে গণমাধ্যমকে তার অন্যতম প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার হেন অপচেষ্টা নেই, যা ক্ষমতাসীন মহল এই সময়ের মধ্যে গ্রহণ করেনি। বিজ্ঞাপন বন্ধ, টেলিভিশনে কালো তালিকা প্রণয়ন, সরকারি দলের চেলা-চামুণ্ডাদের হুমকি–এসব পন্থা মাত্রাভেদে সব সরকারই বিভিন্ন সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যবহার করেছে। তবে দিনবদলের সরকার যে ভিন্নমত দমনের জন্য অন্য প্রকারের ভয়ঙ্কর চণ্ডনীতি ব্যবহার করবে, সেটা বোঝা গিয়েছিল ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের সরকারী প্রতিক্রিয়া থেকে। পেশাদার কিংবা 'চান্স' নির্বিশেষে পত্রিকার সম্পাদকদের ধরে ধরে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের বর্বর নজির সৃষ্টিতে বর্তমান ক্ষমতাসীন মহল সভ্যতা-ভব্যতা, রীতি-নীতি, আইন-কানুনের কোনোরকম তোয়াক্কা করেনি।

সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ পেশাদার সম্পাদক এবং নির্ভেজাল ভালোমানুষ দৈনিক সংগ্রামের আবুল আসাদের দুর্বল শরীরের দিকে তাকিয়েও পুলিশের অন্যায় ও আইন বহির্ভূত রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করতে 'স্বাধীন' আদালতের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়নি! প্রথম আলোর প্রভাবশালী সম্পাদক মতিউর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিকী রীতিমত আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন ডেকে যখন ইচ্ছা গ্রেফতারের হুমকি দিয়েছেন। মার্কিন দূতাবাসের সরাসরি হস্তক্ষেপে সেই বিশিষ্ট সুশীল (?) সম্পাদক আমার ও আসাদ ভাই-এর ভাগ্য বরণ করা থেকে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন। শীর্ষ কাগজের সম্পাদক একরামুল হককে রিমান্ডে নিয়ে তার পত্রিকা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

আমার বিষয় নিয়ে দেশে-বিদেশে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে, সেগুলোর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা, পত্রিকা সম্পাদক নামক ইনস্টিটিউশনটিকে অমর্যাদা করা বর্তমান সরকারের আমলে ডাল-ভাতে পরিণত হয়েছে। অথচ ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিউটের (আইপিআই) নির্বাহী পরিচালক আলিসন

www.pathagar.com

বেথেল ম্যাকেঞ্জি তার বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কী অম্লান বদনেই না দাবি করলেন যে, তার আমলে নাকি সরকার কোনো সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করেনি! সেদিন তিনি বলেছেন, যে মামলাগুলো হয়েছে বা হচ্ছে তার সবই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের দায়েরকৃত মানহানি মামলা। প্রধানমন্ত্রীর আসনে থেকে অসত্য ভাষণ সেই আসনের জন্য যে বিশ্রী রকমের অমর্যাদাকর একথার সঙ্গে আশা করি, সব পাঠক একমত হবেন।

আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা রেকর্ড সংখ্যক ৫৩টি মামলার মধ্যে অন্তত পাঁচটির বাদী সরকার নিজে এবং বাকি মামলাগুলোও সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও সরকারি দলের নেতারা করেছেন। সরকারি অভিযোগের মধ্যে রয়েছে পুলিশের কর্তব্যকাজে বাধা, রাষ্ট্রদ্রোহ, ইসলামী জঙ্গিবাদে মদত দান, জালিয়াতি এবং বেশুমার ব্যক্তির মানহানি। আমাকে হয়তো 'চান্স সম্পাদক' বিবেচনা করেই আইপিআই'র নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী এসব মামলাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। কিন্তু প্রবীণ সম্পাদক আবুল আসাদকে গাড়ি পোড়ানোর অবিশ্বাস্য অভিযোগে মধ্যরাতে বাসা থেকে এলিট বাহিনী র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার এবং পরে রিমান্ডে পাঠানোর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর বেমালুম ভুলে যাওয়া বিস্ময়কর। অন্তত আবুল আসাদকে পেশাদার সম্পাদক মেনে না নেয়ার কোনো সুযোগ সম্ভবত মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার নেই। বয়সে আবুল আসাদের চেয়েও প্রবীণ, মনের দিক দিয়ে অবশ্য চিরসবুজ সাংবাদিক, সম্পাদক শফিক রেহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানি মামলার বাদীর নাম আলহাজ্ব লায়ন মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। ভদ্রলোক আওয়ামী লীগেরই অঙ্গসংগঠন আওয়ামী ওলামা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি।

শীর্ষ নিউজ ডট কমের সম্পাদক একরামুল হকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে তার পত্রিকায় একজন মন্ত্রীর দুর্নীতির খবর প্রকাশের পর। মামলা দায়েরের আগে শীর্ষ কাগজের সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছিল। চাঁদাবাজি মামলার ছুতো ধরেই তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মুখে সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যম বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং, সম্পাদকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রতিটি মানহানি কিংবা চাঁদাবাজি মামলার পেছনের কলকাঠি যে সরকারই নেড়েছে, এ নিয়ে জনমনে অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী অব্যাহতভাবে অসত্য দাবি করে যেতে পারেন, তবে দেশে-বিদেশে তার এসব কথা কেবল কৌতুকেরই সৃষ্টি করবে। তবে, এটা মানতে হবে যে রিমান্ডে নিয়ে পিটুনি দিলেও সরকার এখনো পর্যন্ত রাজধানীর কোনো পত্রিকা সম্পাদককে হত্যার মতো চরম পন্থা গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

আমার ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট থানায় একদল আততায়ী পাঠিয়েও অজানা কারণে নীতিনির্ধারকরা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আমার ভাগ্য সহায় হলেও সাগর এবং রুনি খুনিদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক দম্পতি তাদেরই শয়নকক্ষে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র থাকলে এই কলঙ্কজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা সরকার না হলেও অন্তত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এতদিনে পদত্যাগ করতেন। পাঠক বলতে পারেন, বাংলাদেশের মন্ত্রীদের কাছ থেকে এতটা বিবেকবোধ আশা করাটাই এক প্রকার ইউটোপিয়া। উল্টো এ দেশে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিচার দাবি করার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী এবং আদালতের কাছ থেকে গণমাধ্যমের কর্মীদের তিরস্কার শুনতে হচ্ছে। সাগর-রুনি হত্যার রহস্য উন্মোচন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের প্রতিটি মহল প্রথমাবধি রহস্যময় আচরণ করে চলেছে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের রথী-মহারথীরা গত প্রায় চার সপ্তাহে কে কী বলেছেন, তার একটা তালিকা জনস্বার্থেই প্রস্তুত করেছি, যাতে ভবিষ্যতে বিপদ বুঝে এরা আগের দেয়া বক্তব্য বেমালুম অস্বীকার করতে না পারেন।

* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সরকারের পক্ষে কারও বেডরুমে গিয়ে পাহারা দেয়া সম্ভব নয়। সাগর-রুনি তাদের বেডরুমে মারা গেছে। আমরা কি মানুষের বেডরুমে বেডরুমে পুলিশ বসাতে পারব?

* স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন

১. ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাগর ও রুনির হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা হবে।
২. মিডিয়ার চাপেই ৪৮ ঘণ্টার কথা বলেছি, এটি কৌশলও ছিল।
৩. আপনারা অপেক্ষা করুন, যে কোনো মুহূর্তে সুখবর শুনতে পারবেন।
৪. সাংবাদিক দম্পতি হত্যা-মামলা প্রধানমন্ত্রী নিজেই মনিটর করছেন।
৫. তদন্ত এগিয়ে গেছে, তদন্ত কর্মকর্তারা অতি দ্রুত একটি ভালো ফল দেবেন।
৬. সাংবাদিক দম্পতি হত্যাকাণ্ডের সুরাহা হবেই।

* সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকারীদের গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনকে চাপ দিলে তারা ঘাবড়ে যেতে পারে।

* স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু

আইন-শৃঙ্খলা অবনতিসহ ঢাকায় সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবির জড়িত রয়েছে।

www.pathagar.com

* আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার
তদন্ত শেষ করতে না পারলেও প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। খুব শিগগির আপনাদের এ ব্যাপারে ইতিবাচক অগ্রগতির কথা জানাতে পারব।
* ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদ
তদন্তের কাজ ডেডলাইন দিয়ে হয় না।
* মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির হত্যার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করলে তদন্ত 'বিপথে' যেতে পারে, তাড়াহুড়া করলে প্রকৃত অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে জজ মিয়া নাটকের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
* ডিসি ডিবি মনিরুল ইসলাম
হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
* প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ
সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, বিঘ্ন করতে চায় সামাজিক জীবন তাদের দ্বারাই এমন ঘটনা ঘটানো সম্ভব।
* প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (মিডিয়া) মাহবুবুল আলম শাকিল
আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকাকালে মেহেরুন রুনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিরোধী দলের সংবাদ কাভার করতেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাকে খুব স্নেহ করতেন।

সাগর-রুনির ভয়ঙ্কর হত্যার ঘটনাটিকে প্রশাসন প্রথমেই পরকীয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার কৌশল গ্রহণ করে। জনমনে রুনি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারপন্থী পত্রিকায় সোৎসাহে তার চরিত্র হনন শুরু হয়। নিহত হওয়ার পূর্ব সপ্তাহে সে তার কোন ছেলেবন্ধুকে কতগুলো এসএমএস পাঠিয়েছে, মোবাইলে কতক্ষণ কথা বলেছে এসব কেচ্ছা-কাহিনী প্রকাশ পেতে থাকে সেইসব পত্র-পত্রিকায়। শুনেছি কাকের মাংস নাকি কাক খায় না। সাগর-রুনির ক্ষেত্রে দেখলাম একশ্রেণীর সাংবাদিক তাদের সহকর্মীদের মাংসভক্ষণ করতে যথেষ্ট আনন্দই পায়! রুচি বহির্ভূত এসব আদি রসাত্মক কাহিনী বিশেষ মহল থেকে আমাদের সাংবাদিকদেরও গেলানোর চেষ্টা করা হলেও স্বাধীনতার কথা বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমার দেশ-কে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়নি। আমরা মহান সাংবাদিকতা পেশার সত্যনিষ্ঠতার প্রতি অবিচল থেকে প্রশাসনের দলবাজ কর্মকর্তাদের তদন্ত ভিন্নপথে ঘোরানোর অপচেষ্টা সম্পর্কে পাঠককে আগাম সতর্ক করেছি। রুনি ও সাগরের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দেয়ার পরিবর্তে হত্যার রহস্য উদঘাটনকেই আমার দেশ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে। হত্যা রহস্য

www.pathagar.com

উদঘাটনের দাবিতে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে গেছি। বিভিন্ন ব্লগে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে অপ্রমাণিত বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রকাশিত হলেও একইভাবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতিতে অবিচল থেকে আমরা সেগুলোকেও সযতনে পরিহার করেছি। ব্লগে প্রচারিত ষড়যন্ত্রের গল্পগুলোর সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ দেয়া থাকলে নির্দ্বিধায় আমার দেশ সেগুলো প্রকাশ করত। ভবিষ্যতে কোনো অনুসন্ধানী সাংবাদিক তথ্য-প্রমাণসহ সরকারের ওপর মহলের সেইসব ব্যক্তিদের এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ দিতে পারলে অবশ্যই সেই কাহিনী প্রকাশ করা হবে।

এর মধ্যে সংবাদপত্র মালিকদের মধ্যকার এক ক্ষুদ্র সুশীল(?) গোষ্ঠীর এলিট সংগঠন নোয়াব এক বিবৃতি দিয়ে আমাদের হতবাক করেছে। সেই বিবৃতিতে তারা সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো অনুমাননির্ভর খবর না ছাপতে এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে গণমাধ্যমের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজব কাণ্ড! পত্রিকার মালিকগোষ্ঠী কাদের উদ্দেশ করে বিবৃতি দিচ্ছেন? তারা স্ব স্ব পত্রিকায় এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করলেই তো এই সমস্যার উদ্ভব হতো না। তাছাড়া এই বিবৃতির মাধ্যমে মালিকরা স্বীকার করে নিলেন যে, তাদের পত্রিকায় দায়িত্বহীন আচরণ করা হয় এবং সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সংবাদ পরিবেশনের বেলায় দায়িত্বশীলতার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো অনুমাননির্ভর সংবাদ ছাপা থেকে বিরত থাকার আহ্বান সংবলিত বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা সরবরাহকৃত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অপ্রমাণিত সংবাদ নোয়াব-এর অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাতেই নিয়মিত ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে। কথায় ও কাজে বিপরীতধর্মী আচরণ কেবল রাজনীতিকদের মধ্যে নয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডে সর্বশেষ নাটকীয়তা আনয়নে মহামহিম আদালত বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আদালতপাড়ায় সবিশেষ পরিচিত আওয়ামীপন্থী আইনজীবী অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোরশেদ বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এক জনসভায় প্রদত্ত একটি বক্তব্য নিয়ে ভর্ৎসনার (Censure) উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিলেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের দ্বৈত বেঞ্চে। তার লক্ষ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে। হাইকোর্টের এই মাননীয় বিচারপতি বেগম খালেদা জিয়ার মন্তব্যকে এতই গর্হিত বিবেচনা করেছেন যে, তার সমালোচনা জানানোর উপযুক্ত ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পাননি। হত্যারহস্য উন্মোচনে সরকারের যাবতীয় পদক্ষেপেও একই আদালত অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শুধু তা-ই নয়,

www.pathagar.com

নাগরিকের বেডরুম পাহারা দেয়া বিষয়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরম বিতর্কিত বক্তব্যকেও সঠিক বিবেচনা করেছেন বহুল আলোচিত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী। বেগম খালেদা জিয়ার অপরাধ হলো, তিনি লালমনিরহাটের জনসভায় বলেছেন যে সাগর-রুনির কাছে সরকারের দুর্নীতির তথ্য থাকার কারণেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। একজন রাজনীতিবিদ তার বক্তব্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটাবেন, এটাই প্রত্যাশিত। বিএনপি চেয়ারপার্সনও তার বক্তৃতায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা বিশ্বাস করে, সেটাই নিজস্ব ভাষায় বিবৃত করেছেন। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর দ্বৈত বেঞ্চের দৃষ্টিতে অবশ্য সেই বক্তব্য অতীব গর্হিত বিবেচিত হয়েছে।

আদালত থেকে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে গণমাধ্যমে জজ মিয়া নাটক জাতীয় বাক্যাবলী আর লেখা যাবে না এবং তথ্যসচিব গণমাধ্যমের ওপর হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক আরোপিত এই সেন্সরশিপ দেখভাল করবেন। সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে দীর্ঘদিন পর ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিক নেতারা স্বাভাবিকভাবেই আদালতের নির্দেশে অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিষয়টিকে তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর আঘাতরূপেই বিবেচনা করছেন। সাংবাদিক মহলে কট্টর আওয়ামীপন্থী নেতারূপে পরিচিত ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলের বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেছেন, 'পৃথিবীর কোথাও গণমাধ্যমের কাজে আদালতের এরকম হস্তক্ষেপের নজির নেই। আদালত কেন, কারও নির্দেশনা মেনে গণমাধ্যম দায়িত্ব পালন করবে না। হাইকোর্টের আদেশ অগ্রহণযোগ্য।' আওয়ামীপন্থী বিএফইউজের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী মার্চের ১ তারিখে সাংবাদিকদের দিনব্যাপী গণঅনশনে সভাপতির বক্তব্যে বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশনা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। গণমাধ্যমের ওপর বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ সাংবাদিক সমাজ সহ্য করবে না। দু'একজন অবিবেচক বিচারপতির কারণে আদালত ও গণমাধ্যম যেন মুখোমুখি চলে না আসে, সেজন্য পদক্ষেপ নিতে প্রধান বিচারপতির কাছে আহ্বান জানাই।'

মনে হচ্ছে, আসলেই বাংলাদেশে অনভিপ্রেতভাবে আদালত এবং গণমাধ্যম ক্রমেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সাগর-রুনির হত্যার তদন্তের সংবাদ পরিবেশনা নিয়ে হাইকোর্টের রুল প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন জনমনে উত্থাপিত হয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম বিচারাধীন কোনো বিষয়ে লেখালেখি করা বাঞ্ছনীয় নয়। এখন থেকে কি তদন্তাধীন বিষয় নিয়েও সংবাদপত্রে লেখা বা গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো? আইনের দৃষ্টিতে আদালতে বিচারাধীন এবং পুলিশের তদন্তাধীন বিষয় কি এক? তাছাড়া যে

www.pathagar.com

দেশের তথ্য আইনে জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, সে দেশেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সেন্সরশিপ আরোপের যে কোনো অপচেষ্টাই নিন্দনীয়। অতি উৎসাহী বাদী অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোরশেদ একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে আদালতে টেনে নিয়ে অযথাই আদালতকে আবারও বিতর্কিত করলেন। এই আইনজীবীর মতো ব্যক্তিরা যে কখনোই আদালতের বন্ধু নন, সে বিষয়টি মাননীয় বিচারপতিরা যত দ্রুত বুঝবেন, ততই বিচার ব্যবস্থার জন্য মঙ্গল হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এতসব ডামাডোলে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে নৃশংস ও আলোচিত হত্যাকাণ্ডটি ধামাচাপা পড়ার আশঙ্কাই জনমনে দৃঢ়তর হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেফতার করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আজ ২৬ দিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ হত্যাকাণ্ডের কোনো কূল-কিনারা করতে সক্ষম হয়নি। আদালত প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু জনগণ যে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না এটাই বাস্তবতা। মানুষের মন আদালতের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যে যায় না এ বিষয়টি সংশ্লিষ্টরা স্মরণে রাখলে ভালো করবেন।

তরুণ সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনিকে তাদেরই শয়ন কক্ষে ঢুকে হত্যাকারীরা অত্যন্ত নির্মমভাবে যখন হত্যা করছিল, তখন পাশের ঘরে নিহতদের একমাত্র শিশুপুত্র মেঘ ঘুমিয়ে ছিল। সেই অবোধ, ঘুমন্ত শিশু জানতেও পারেনি গভীর নিশীথে তার কত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে। এই মানসিক আঘাত থেকে মেঘ কোনোদিন মুক্তি পাবে কিনা, জানি না। ফ্যাসিবাদী মহাজোট সরকারের অধীনস্থ রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল অংশ সম্মিলিতভাবে মেঘের নিহত পিতা-মাতাকে চরিত্রহননসহ অন্যান্য পন্থায় বড় নির্মমভাবে বার বার খুন করছে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, যেন এই দুর্বিনীত শাসকশ্রেণীর ওপর তাঁর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।

৭ মার্চ ২০১২

www.pathagar.com

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

চব্বিশটি দিন লন্ডনে চিকিৎসা শেষে গত শুক্রবার দেশে ফিরেছি। ডান চোয়ালের একটা হাড়ে ক্ষয় দেখা দিয়েছিল, ডাক্তারি পরিভাষায় যার নাম osteoarthritis। আমার শরীরে হাড়ের বিভিন্ন স্থানে সমস্যা রয়েছে। কোমরে osteoporosis, কাঁধে spondilitis এবং চোয়ালে osteoarthritis। ২০১০ এবং ২০১১ সালে দশ মাসের জেল জীবনের কষ্ট ও চিকিৎসার অভাবে এই সমস্যাগুলো জটিলতর হয়েছে।

মুক্তি পাওয়ার মাস তিনেক বাদেই লক্ষ্য করলাম, মুখের ডান দিক দিয়ে খাদ্য চিবুতে কষ্ট হচ্ছে, আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসেবে ডান কানে তীব্র ব্যথা। ঢাকা, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ঘোরাঘুরি করে রোগটা ধরা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত লন্ডন যেতেই মনস্থ করলাম। দুর্ভাবনা ছিল শেখ হাসিনার 'গণতান্ত্রিক' সরকার যেতে দেয় কীনা। সংশয় নিয়েই ১০ এপ্রিল বিমানবন্দরে পৌছে সোজা চলে গেলাম ওসি'র কক্ষে। সঙ্গের কাগজপত্র ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললাম, ওপরে খোঁজখবর নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে। সস্ত্রীক অপেক্ষা করতে লাগলাম ওসি'র অফিসকক্ষের বাইরে আম যাত্রীদের আসনে বসে। এবার অবশ্য আমার অতিরিক্ত একটা সুবিধা ছিল। যুক্তরাজ্যে যাওয়া এবং সেখান থেকে আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সম্ভবত সেই কাগজের জোরেই আধঘণ্টার মধ্যেই ছাড়পত্র মিলল। অবশ্য এ মাসের ৪ তারিখে ফেরার পথে বিমানবন্দরে নতুন বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তবে সে ঘটনা লেখার শেষে বর্ণনা করব।

১৩ তারিখে ডাক্তার পরীক্ষা করে হাড়ের অতিরিক্ত ক্ষয়ের বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে অধিকতর পরীক্ষার জন্য CT Scan করতে পাঠালেন। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, হাড় অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। ২৩ এপ্রিল অস্ত্রোপচারের আগেই লন্ডনে বসে দুর্মুখ রাজনীতিবিদ, রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত বাবুর ঘুষ খাওয়া আর অনুজপ্রতিম রাজনীতিক ইলিয়াস আলীর গুমের দুঃসংবাদ পেলাম। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের রেলমন্ত্রীর ঘুষ নেয়ার সংবাদে মোটেও অবাক হইনি। বরঞ্চ ঘটনাটি আমার কাছে

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনদের সাড়ে তিন বছরব্যাপী দুর্নীতির বিশাল হিমশৈলের সামান্য দৃশ্যমান চূড়ার (tip of the iceberg) মতোই ঠেকেছে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে আমি কেবল মন্ত্রীর গাড়ি চালক আলী আজমকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়েছি। সেই গভীর রাতে সে সাহস করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পিলখানার বিডিআর সদর দফতরের ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে চোর মন্ত্রীর সহযোগীদেরসহ বমাল ধরা পড়ার ব্যবস্থা করেছে। কোনো সভ্য রাষ্ট্র হলে আলী আজমকে নিয়ে এতদিনে হৈচৈ পড়ে যেত। রাষ্ট্র ও সমাজ তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করত।

কিন্তু, আমার অভাগা মাতৃভূমি বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার ঘুণপোকার মতো প্রবেশ করেছে। তাই এই রাষ্ট্রে প্রবল ক্ষমতাধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী বহাল তবিয়তে থাকেন। জনগণের করের টাকায় নির্লজ্জের মতো বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। মন্ত্রীর দুর্নীতিলব্ধ অর্থ দিয়ে তার পুত্র বুক ফুলিয়ে টেলিকম লাইসেন্স ক্রয় করে। আর অসীম সাহসী, দরিদ্র গাড়িচালক গুম হয়ে যায়। এমন নির্যাতক রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। তাই আমি এই ব্যবস্থার অবধারিত ধ্বংস এবং অন্যায় সহ্যকারী, ভীরু জনগণের অনাগত দুঃখ-কষ্টের পানে চেয়ে থাকি। সুরঞ্জিত বাবুদের মতো বহুরূপী, চাপাসর্বস্ব, বিবেক বিবর্জিত রাজনীতিবিদদের নিয়ে লিখে সময় এবং কাগজ নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। এই অশক্ত শরীরে আমি প্রধানত ইলিয়াস আলীর গুম এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের অপকর্মের প্রতিবাদ করতেই কষ্ট করে লেখার টেবিলে বসেছি।

এপ্রিলের ১০ তারিখে লন্ডন রওনা হয়েছিলাম। তার মাত্র দিন দুয়েক আগেই ইলিয়াস আমার দেশ কার্যালয়ে গল্প করতে এসেছিল। সময়-সুযোগ পেলেই ইলিয়াস আমার কাছে আসত। বিএনপি'র দলীয় রাজনীতি, ভারতীয় আগ্রাসন, টিপাইমুখ বাঁধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সেদিনও আমরা দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছিলাম। এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতাটিকে যারা কাছ থেকে চেনেন, তাদেরই ওর খানিকটা বেপরোয়া, শিশুসুলভ স্বভাবটিকে জানার কথা। নানা বিষয় নিয়ে হৈচৈ করত, জিয়া পরিবার ব্যতীত দলের অন্যান্য সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে বড় একটা তোয়াজ করতে চাইত না। কিন্তু মনটা বড় ভালো, জাতীয়তাবাদী আদর্শের একজন নিখাদ সৈনিক। আমাদের গল্পের মাঝখানে হঠাৎ করে প্রবীণ প্রকৌশলী, পেশাজীবী আন্দোলনে আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী আনহ আখতার হোসেনও যোগ দিয়েছিলেন। ইলিয়াস তার নানারকম বিপদের আশঙ্কার কথা আমাকে বলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ভারত এবং তাদের পদলেহী ক্ষমতাসীন মহল ইলিয়াস আলীর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে

www.pathagar.com

তার বিপুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ছিল। সাইফুর রহমানের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর সিলেটের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, ইলিয়াস তা ধীরে ধীরে পূর্ণ করে আনছিল।

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ ও সিলেটবাসীর ব্যানারে ভারতীয় ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সিলেট থেকে জৈন্তাপুর পর্যন্ত সহস্রাধিক যানবাহন নিয়ে আমরা গত বছর যে বিশাল লংমার্চ করেছিলাম, তার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছিল ইলিয়াস। আজ ওর অন্তর্ধান নিয়ে লিখতে বসে সেদিনের একটা ঘটনার কথা বড় মনে পড়ছে। আমাদের গাড়িবহর সীমান্তের একেবারে পাশ ঘেঁষে জৈন্তাপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে, সীমান্তের ওপারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী বিএসএফের ক্যাম্পগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাড়িবহরের একেবারে মাথায় আমি এবং ইলিয়াস হুড খোলা জিপে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বেশ ধীরেই এগোচ্ছি। এমন সময় ইলিয়াস স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলে উঠল–মাহমুদ ভাই, ভারতীয় শাসকশ্রেণীর কাছে আপনি এবং আমি অন্যতম শত্রু। সম্ভবতঃ এই মুহূর্তে ওদের বন্দুকের সীমানার মধ্যে আমরা দু'জনা রয়েছি। এই সুযোগে আমাদের গুলি করে মেরেও তো দিতে পারে। জবাবে আমি বলেছিলাম, এমন প্রকাশ্যে ওরা আমাদের মারবে না। শেখ হাসিনার Death Squad আমার রিমান্ডকালে ক্যান্টনমেন্ট থানায় গভীর রাতে প্রবেশ করেও আমাকে একেবারে শেষ করে দেয়নি। ওরা নীরব ঘাতক। সুযোগ বুঝে এমনভাবে মারবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। অর্থাৎ মারবে, তবে প্রমাণ রাখবে না। একই গাড়িতে চলতে চলতে সহযাত্রী ড্যাব নেতা ডা. জাহিদ হোসেন এবং কবি আবদুল হাই শিকদার আমাদের কথা শুনে যথেষ্ট উদ্বেগ সহকারে মন্তব্য করেছিলেন, আপনাদের সাবধানে চলাচল করা দরকার।

দেশ ও জাতির শত্রুরা কেমন করে ঢাকার রাজপথ থেকে ইলিয়াসকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, জানি না। ও এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে তাও সম্ভবত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ বাহিনীতে তার বিশ্বস্ত গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে ওপর থেকে অবশ্যই শেষ বিচারের মালিক মহান আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন। ইলিয়াসের মা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ আপনজন এবং আমাদের মতো শুভানুধ্যায়ীরা আজও তার পথচেয়ে আছে। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, এই সরকারের সুমতি হোক, ইলিয়াসসহ সব গুম করা ব্যক্তিকে আপনজনের কাছে সত্বর জীবিত ফিরিয়ে দিক।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বিনীত শাসকশ্রেণী বর্তমানে দেশটি শাসন করছে। এই সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে লেশমাত্র বিবেক, নীতি অথবা লজ্জাবোধ আর অবশিষ্ট নেই। ইলিয়াস আলীকে গুম করার পর থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীসহ নীতিনির্ধারকবৃন্দ যে ধরনের উদ্ধত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন, তার মধ্য থেকেই এদের সার্বিক দেউলিয়াপনা প্রকাশিত হয়েছে। আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবীরা দেশের ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে নিম্নশ্রেণীর চাটুকারিতার স্বাক্ষর রেখে প্রধানমন্ত্রীকে তথাকথিত সমুদ্র বিজয়ের জন্য গণসংবর্ধনা দিয়ে টাকা ও রুচির শ্রাদ্ধ করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক মানপত্র পাঠ করেছেন। এই ভদ্রলোকের কবিতা যে অতি উচ্চমানের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তার লেখা 'ঢাকায় প্রথম বসতি' কবিতাটা যে কতবার পড়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। আমি পুরনো ঢাকায় বড় হয়েছি। এই কবিতায় চেনা সব জায়গার অসাধারণ কাব্যিক বর্ণনা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত মনটাকে বড় উদাস করে দিত। চোখে পানি চলে আসত।

তবে উন্নত সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ হকের ব্যক্তি চরিত্র কতখানি নিম্নমানের, সেটা জানার জন্য চিন্তা-চেতনায় তারই স্বগোত্রীয়, দীর্ঘদিন ধরে ভারতমাতার কোলে ঠাঁই নেয়া তসলিমা নাসরিনের বই পাঠ করলেই চলবে। কাজেই আবদুল হাই শিকদারের ভাষায় তার কদমবুসি আচরণে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ নেই। তবে শেখ হাসিনার সেই সংবর্ধনায় অশীতিপর শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং প্রবীণ দক্ষ চিত্রকর কাইয়ুম চৌধুরীর মতো ব্যক্তিদের নিম্নরুচির চাটুকারিতা আমাদের প্রচণ্ড রকম বেদনাহত করেছে। সেই ছাত্রজীবন থেকে এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড়াই শুনতে শুনতে আমরাই জীবনের পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে গেছি। বুঝতে পারি না এই ব্যক্তিদের আর কী চাওয়া-পাওয়ার থাকতে পারে যে এতটা নিচে নামতে হবে। সারাদেশ যখন গুম-খুনের আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছে, তখন তাদের আয়োজিত সংবর্ধনায় শাসকদের প্রতি তোষামোদি বাক্য শুনে বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিকের মনে ঘৃণাপ্রসূত বমনেচ্ছার উদ্রেক হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে তারা ভুলেও ইলিয়াসের নামটাও উচ্চারণ করেননি।

বিদ্বানের চাটুকারিতা প্রসঙ্গে আমাদের মহানবীর একটি সুবিখ্যাত হাদিস রয়েছে, যেটি পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ইরানি সুফি জালালউদ্দিন রুমি তার লেখায় ব্যাখ্যা করেছেন। হাদিসটি আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু অনূদিত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী'র সংলাপ থেকে উদ্ধৃত করছি : রুমী উল্লেখ করেছেন, "মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একবার বলেছেন, ওইসব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সবচেয়ে অধঃপতিত, যারা বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় আর সর্বোত্তম বাদশাহ তারাই, যারা

www.pathagar.com

বিজ্ঞজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। জ্ঞানী বাদশাহ তিনিই, যিনি দরিদ্রের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ান, আর অধঃপতিত দরিদ্র তারাই যারা বাদশাহর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।"

মেঘে মেঘে তো বেলা কম হলো না। এবার ইহজাগতিকতা বাদ রেখে একটু পরকালের কথা ভাবলে হতো না! অবশ্য এ দেশের আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক'জন প্রকৃতই পরকালে বিশ্বাস রাখেন, সেটা নিয়ে আমার মনে অন্তত যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যারা ইহজগতকেই একমাত্র মোক্ষ বিবেচনা করেন, তারা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট খোঁজার কাজে ব্যাপৃত থাকবেন, এতে আর আশ্চর্য কী? ক্ষোভে-দুঃখে বিষয়ের খানিক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচণ্ড অহমিকা ও বলদর্পী ফ্যাসিবাদী আচরণের কথা লিখতে গিয়ে বশংবদ বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম।

২০০৮ সালে শেখ হাসিনা এবং তার মহাজোট মার্কিন ও ভারতের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কী কারণে এই আশীর্বাদ তার পায়ের তলায় তখন গড়াগড়ি খেয়েছিল, সে সম্পর্কে গত সাড়ে তিন বছরের লেখালেখিতে যথাসম্ভব বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আজ আর পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে বর্তমান পরিস্থিতির ওপরই কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি। কাছের ও দূরের সাম্রাজ্যবাদের আশকারায় ক্ষমতাসীন মহল তাদের এবারের মেয়াদে একদিকে যেমন সুশাসন নির্বাসনে পাঠিয়ে দুর্নীতির মহোৎসব বসিয়েছে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে কাঁচকলা দেখিয়ে সকল প্রকার ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে সরাসরি ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নির্বিচারে হত্যা-গুম চলছে, এমনকি পশ্চিমাদের অতি কাছের সুশীলদের (?) পর্যন্ত এরা ছেড়ে কথা কয়নি। বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূস গ্রেফতার ও রিমান্ড থেকে বেঁচেছেন বটে, কিন্তু তাকে যে প্রক্রিয়ায় ও পরিমাণে হেনস্থা করা হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমত একখানা মহাভারত রচনা করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অতি প্রভাবশালী ক্লিনটন পরিবারের ব্যক্তিগত বন্ধুকে চূড়ান্ত অপমান করার স্পর্ধা গণতন্ত্রের কথিত মানসকন্যা শেখ হাসিনাকে কাকতালীয়ভাবে মার্কিনিরাই সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশে এক বায়বীয় ইসলামী জঙ্গি জুজুর ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনা ভেবেছিলেন, তার তাবৎ অপকর্ম তিনি জায়েজ করতে সক্ষম হবেন। বছর তিনেক পর্যন্ত তার কৌশল যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হওয়ার পর, হালে মনে হচ্ছে তিনি লক্ষণরেখা অবশেষে অতিক্রম করেই ফেলেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

www.pathagar.com

ও ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর ঢাকায় অতি সাম্প্রতিক যৌথ সফর তার জন্য অশনি সঙ্কেতই বহন করে এনেছে। বাংলাদেশে সাড়ে তিন বছরের স্বৈরশাসন বিনাবাক্যে সহ্য করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র, দুর্নীতি, সুশাসন, মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার হয়েছে। একই সময়ে প্রণব মুখার্জির বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাতে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব ও আগামী নির্বাচন বিষয়ে তার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ভারতের অর্থমন্ত্রীর এটা তৃতীয় বাংলাদেশ সফর। আগের দু'বারে তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতেরও সময় করে উঠতে পারেননি। এবার তিনি কেবল সাক্ষাৎই করেননি, অনেকটা বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ভারত বাংলাদেশে কোনোরকম একতরফা নির্বাচন চায় না।

তাছাড়া, প্রথম বারের মতো তিনি এ দেশের কোনো একটি বিশেষ দলের পরিবর্তে জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের শাসকশ্রেণীর অবস্থানের প্রকৃতই যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে উপমহাদেশে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ভারতীয় হাইকমিশন আমার দেশসহ ছয়টি বিশেষ পত্রিকার সম্পাদককে আমন্ত্রণ তালিকার বাইরে রেখে তাদের আধিপত্যবাদী, অসহিষ্ণু চরিত্রকেই পুনর্বার উন্মোচিত করেছে। হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে দীপু মনি এবং শেখ হাসিনার বৈঠকের সময়ও আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিককে খবর সংগ্রহের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢুকতে দেয়া হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশা করি, এটুকু মানবেন যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র প্রথম আলো হলেও সর্বাধিক আলোচিত কিন্তু আমার দেশই। যাই হোক, প্রণব মুখার্জির কথা ও কাজে মিল খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের বেশ কিছু কাল আরও অপেক্ষা করতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। তারপরও ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের নতুন সুর এ দেশের জনগণকে কিছুটা হলেও আশান্বিত করেছে। সব মিলে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মহলের জন্য হিলারি ক্লিনটন এবং প্রণব মুখার্জির সফর যে আনন্দদায়ক হয়নি, সেটি বাগাড়ম্বরপ্রিয় মহাজোট মন্ত্রীদের আপাত নীরবতা থেকে কিছুটা বোধগম্য হচ্ছে।

ইলিয়াস আলীকে গুম এবং বিরোধীদলের প্রায় তিন ডজন শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বানোয়াট মামলা দায়ের করে শেখ হাসিনার সরকার ভিন্নমতকে আতঙ্কগ্রস্ত করে কোণঠাসা করার যে আয়োজন করেছিল, সেটাও বুমেরাং হয়ে তাদেরকেই আঘাত করেছে। গুমের পর নিহত আশুলিয়া অঞ্চলের শ্রমিক নেতা

www.pathagar.com

আমিনুল ইসলাম এবং ইলিয়াস আলীর নাম মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন তার ঢাকা সফরকালে বিভিন্ন বক্তব্যে বারংবার উল্লেখ করে সম্ভবত সরকারকে এক প্রকার সতর্ক বার্তা দিতে চেয়েছেন। গণতন্ত্রের নামে এভাবে গুম-খুনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর প্রশ্রয় দেবে না বলেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে দেশবাসীর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায়, শেখ হাসিনার উচিত হবে আর সময় ক্ষেপণ না করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় খুঁজে বের করার জন্য বিরোধী দলের সঙ্গে আন্তরিক সংলাপে বসা। প্রধানমন্ত্রীর তিন দশকের রাজনীতি এবং দুই দফায় সাড়ে আট বছরের শাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর লিখতে বসে শেক্‌স্‌পিয়রের অসাধারণ এক উক্তির কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে–

"Vengeance is in my heart,

death in my hand,

blood and revenge are hammering in my head".

(হৃদয়ে আমার প্রতিহিংসার খেলা

হাতে কেবল মৃত্যু

মস্তিষ্কে রক্ত ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা)

শেক্‌স্‌পিয়র বর্ণিত সেই অসুস্থ রাজনীতি অব্যাহত রাখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করে আবারও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ইচ্ছা পূরণ বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভব হবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

২০০৭ সালে বিএনপির পক্ষে একতরফা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। এবার রাষ্ট্রীয় পেশিশক্তি ও মার্কিন-ভারতের একতরফা সমর্থনের জোরে শেখ হাসিনা সেই গর্হিত কাজটি করে ফেলতে পারবেন, এমন বিকৃত চিন্তা দেশে অবধারিত রক্তক্ষয়ী বিবাদের সূচনা করবে। সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কারও জন্যই সুখকর হবে না। প্রতিহিংসা কেবল প্রতিহিংসারই জন্ম দেবে। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুশীল (?) সমাজের প্রতিনিধিরা একবাক্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন। ভারতীয় অর্থমন্ত্রীও প্রকারান্তরে একই বারতা দিয়ে গেলেন। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অনেক আগেই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পক্ষে রায় দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপিরা অবশ্য জনরোষের ভয়ে এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিরোধিতা করে চলেছেন। এবার অহমিকা ত্যাগ করে শেখ হাসিনার বাস্তবতা উপলব্ধির পালা। অন্যথায় দেশে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করার সকল দায় তাকেই নিতে হবে।

www.pathagar.com

লেখার শুরুতে ঢাকা বিমানবন্দরে বিড়ম্বনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। সেই ঘটনা বিবৃত করেই আজকের মন্তব্য প্রতিবেদনে সমাপ্তি টানব। ৪ তারিখ সকালে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের বিমানে দেশে ফিরে ইমিগ্রেশনের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছি, এমন সময় এসবির একজন কর্মকর্তা এসে আমার পাসপোর্ট নিয়ে আগমন হলের এক কোণে বসতে দিলেন। শুরু হলো প্রতীক্ষা। একে একে সব যাত্রী চলে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীও ইমিগ্রেশনের বাধা পার হয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। আধ ঘণ্টাখানেক পরে খবর পেলাম, তিনি লাগেজ সংগ্রহ করে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কানাঘুষায় শুনলাম আমার নামে নতুন মামলা হয়েছে কিনা, কিংবা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হবে কিনা, এসব নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সিতে খোঁজ-খবর নেয়া চলছে। একজন কর্মকর্তাকে ডেকে বললাম, গ্রেফতারের ভয় পেলে তো বিদেশেই থেকে যেতে পারতাম! বেচারা নিম্নস্তরের কর্মকর্তা। সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক বাদে স্বদেশে ঢোকার ছাড়পত্র মিলল। এতদিন আমাকে দেশের বাইরে যেতে দিতে সরকারের আপত্তি ছিল। এবার মনে হলো, ক্ষমতাসীন মহল আমাকে দেশে ফিরতে দিতেও অনিচ্ছুক। পরবর্তী অভিজ্ঞতার অপেক্ষায় রইলাম।

৯ মে ২০১২

www.pathagar.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে মেধাশূন্য, আওয়ামীপন্থী ভিসি, শিক্ষকদের দুর্নীতি ও দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আমি বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলাম। বুয়েটের কথাই আগে বলি–কারণ সেখানকার শিক্ষকদের মধ্যে শেখ হাসিনার বর্তমান মেয়াদের আগে কখনও রাজনীতির নামে দলবাজির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বুয়েটের শিক্ষকরা কে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, এই খোঁজ-খবর নেয়ার চিন্তা কস্মিনকালেও মনে ঠাঁই পায়নি। সেই পাকিস্তানি আমল থেকে সেখানে ভিসি নিয়োগ সর্বদাই যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হওয়াটাই প্রথা ছিল। ড. রশীদ, ড. নাসের, ড. মোশাররফ হোসেন, ড. মতিন পাটওয়ারী, ড. ইকবাল মাহমুদ, ড. মো. শাহজাহান এবং সর্বশেষ ড. সফিউল্লাহর মতো অসাধারণ বিদ্বান শিক্ষকরা যে চেয়ারে বসেছেন, সেখানে শেখ হাসিনা কেবল দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিয়েছেন ড. নজরুল ইসলামকে। এই ভদ্রলোক দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি আওয়ামী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত এবং তিনি সরকারপন্থী পেশাজীবী সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এই সংগঠনটির সভাপতি পদে আছেন সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

অনেক পাঠকই অবগত আছেন, আমি নিজেও এ ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাবিশিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী প্রকৌশলীদের সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (AEB) এবং জাতীয়তাবাদী পেশাজীবীদের শীর্ষ সংগঠন, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, উভয়ের আহ্বায়কের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করছি। কিন্তু আমার মতো একজন বেসরকারি নাগরিক এবং বুয়েটের ভিসির অবস্থান ও সম্মান কোনোক্রমেই তুলনীয় নয়। তাকে অবশ্যই দলীয় চিন্তা-চেতনার ঊর্ধ্বে থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে কারণেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দসহ দেশের সচেতন নাগরিকরা আশা করেছিলেন যে, ভিসি নিযুক্ত হওয়ার পর অন্তত ড. নজরুল ইসলাম সরকারদলীয় পেশাজীবী সংগঠন থেকে পদত্যাগ করবেন।

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে বর্তমান ভিসি দলীয় লেজুড়বৃত্তিকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। আওয়ামীপন্থী বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের পদ রক্ষা করে তিনি কেবল দলীয় সভায় উপস্থিত থাকেননি–উপরন্তু, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন। বুয়েটের ইতিহাসে কোনো ভিসির এ ধরনের দলীয় সভায় অংশগ্রহণের নজির নেই। এহেন ভিসির আমলে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েটের যে হাল হওয়ার কথা ছিল, তাই হয়েছে। তিনি কয়েক ডজন সিনিয়র শিক্ষককে ডিঙিয়ে নজিরবিহীনভাবে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি ড. হাবিবুর রহমানকে বুয়েটের প্রো-ভিসি পদে নিয়োগ দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনাকাটা ও নিয়োগে ছাত্রলীগের একচ্ছত্র টেণ্ডারবাজি কায়েম করেছেন। এমন দুর্ভাগ্যজনক অভিযোগও শুনতে পাচ্ছি–শিক্ষক নিয়োগ ও পরীক্ষায় নম্বর দেয়া নিয়েও নাকি রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনিরপেক্ষ শিক্ষকদের অব্যাহত প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই অনাচার অব্যাহত থাকায় শেষ পর্যন্ত তারা ধর্মঘটে যেতেও বাধ্য হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ধর্মঘটী শিক্ষকদের ডেকে নিয়ে সমস্যা সমাধানে আশ্বাস প্রদান করায় শিক্ষকরা ক্লাস রুমে ফিরে গেলেও ভিসি ড. নজরুল ইসলামের প্রশাসনে এখন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন আসেনি।

বুয়েটের মহান ঐতিহ্য রক্ষায় দলনিরপেক্ষ আদর্শবান শিক্ষকদের আবারও হয়তো আন্দোলনে ফিরে যেতে হবে। ড. নজরুল দীর্ঘদিন ধরে আইইবি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। তিনি আইইবি ঢাকা সেন্টার এবং কেন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত বছর সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণে আমরা একসঙ্গে পবিত্র হজও পালন করেছি। তার চরিত্রানুযায়ী দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তি ড. নজরুল ইসলাম কোনোদিনই অর্জন করতে সক্ষম হবেন না বলেই আমার ধারণা। সুতরাং বুয়েটের অধঃপতনের জন্য তার তুলনায় তাকে যারা ভিসির অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানিত পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন, তাদেরকেই অধিকতর দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। বুয়েটের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুয়েটকে দলীয়করণের উদগ্র ও অসুস্থ আকাঙ্ক্ষাকেই সার্বিক বিপর্যয়কর অবস্থার জন্য দায়ী করে নিন্দা জানাচ্ছি।

ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একজন দলবাজ উপাচার্য ড. শরীফ এনামুল কবির ছাত্রলীগের পাণ্ডাদের একাংশকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনই ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক তো বটেই এমনকি আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ পর্যন্ত তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘদিন ঘেরাও, বিক্ষোভ, গণঅনশন, ভাংচুর, হাতাহাতি ইত্যাদি চলার পর আবারও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নাকি ভিসিকে শিগগিরই তার পদ থেকে সরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। সেখানকার আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনশন ভাঙিয়ে এসেছেন আওয়ামী লীগের ফতুল্লা আসনের সংসদ সদস্য, এ দেশের চলচ্চিত্রে এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা কবরী। এই প্রবীণ অভিনেত্রীর লেখাপড়া কতদূর এবং তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, এই তথ্য আমার জানা নেই। লোকমুখে শুনেছি, তিনি নাকি স্কুলের গণ্ডিও পার হননি। কেবল সিনেমার নায়িকা হওয়ার সুবাদে দেশের অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠে তার আগমন যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দলবাজিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদ্বয়ের সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি মন্তব্য করেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বুয়েট এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও খারাপ। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক আন্দোলনে সেখানে কর্মবিরতি চললেও ভিসি ড. মুহাম্মদ আলমগীর বহাল তবিয়তে আছেন। কুয়েটে শিক্ষক-ছাত্ররা একবাক্যে বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে আগে কখনও রাজনীতি না থাকলেও ড. আলমগীর সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতি আমদানি করে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে কলুষিত করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ সভাপতি প্রফেসর এম আবদুস সোবহান। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছরে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্রলীগের বেপরোয়া চাঁদাবাজি, ছাত্র হত্যা, গণগ্রেফতার, নিয়োগ বাণিজ্য, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক লাঞ্ছনা, সাংবাদিক নির্যাতন, ভিন্নমত হয়রানিসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা এই সময়ের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি।

বাংলাদেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই প্রকার নোংরা রাজনীতিকরণের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আদালতকে ব্যবহার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮২১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করে ক্ষমতাসীনরা আক্রোশ মিটিয়েছে। একই রকম

www.pathagar.com

দলীয়করণের মহোৎসব চলছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও যে কোনো মুহূর্তে শিক্ষক আন্দোলন বেগবান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নমত দমনে ফ্যাসিবাদী কায়দায় প্রশাসন চালানো হচ্ছে।

মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক নিয়োগে মেধাবীদের আর কোনো জায়গা নেই। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এমনকি পদ না থাকলেও ছাত্রলীগ কর্মীদের চাকরি দেয়ার উৎসাহে দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ দিতেও সরকারের বাধছে না। গত আড়াই বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০টি বিভাগের বিজ্ঞাপিত ১১৭টি পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় ২০৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরও শ'খানেক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ সভাপতি এবং ভিসি আবদুস সোবহান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ-রসায়ন বিভাগে ৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে যোগ্যতায় সর্বনিম্ন দু'টি স্থান অধিকারী অর্থাৎ ৪১ ও ৪২ নম্বরের আবদুর রাকিব ও রওশানুল হাবিবকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফার্মেসি বিভাগে ১৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১১তম অবস্থানে থাকা আবদুল মুহিত চাকরি পেয়েছেন। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যায় চাকরি পেয়েছেন একই বিভাগের আওয়ামীপন্থী প্রভাবশালী শিক্ষক জহুরুল ইসলামের প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী জেবুননেছা ইসলাম। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা প্রদানে তার অযোগ্যতার গল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসির খোরাক জোগাচ্ছে।

এছাড়া একই বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগধারী মনোজ কুমারকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই চরম অনিয়মের বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভকারী শারমীন লীনা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনে (ইউজিসি) লিখিত অভিযোগ করলেও আজ পর্যন্ত তদন্তের কোনো অগ্রগতি হয়নি। রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন ও বিচার, ফোকলোর, সমাজ বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, মার্কেটিং এবং পদার্থ বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিভাগেও শিক্ষক নিয়োগে একইভাবে প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকারীদের বঞ্চিত করে দলীয় বিবেচনায় মেধাতালিকার তলানিতে অবস্থানকারী চূড়ান্ত অযোগ্যদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। অবশ্য শিক্ষক নিয়োগে এই অনিয়ম যে কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে, তা নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে লেখার

www.pathagar.com

কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উদাহরণ টেনেই শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানব।

সেখানে চারুকলা বিভাগে সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তকে বঞ্চিত করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এসএসসি ও এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত এবং পাসকোর্সে ডিগ্রি ও প্রিলিমিনারি মাস্টার্স পাস নাসিমুল কবির ও নাসিমা হককে। ড্রয়িং ও পেইন্টিং বিভাগে তালিকার ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের পরিবর্তে শিক্ষক হয়েছেন তিনটি দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রলীগের সাবেক অনুষদ সভাপতি দুলাল চন্দ্র গাইন। দুলাল বাবু সিলেকশন কমিটির তালিকার ৩৫ জনের মধ্যে ৩৩ নম্বর প্রার্থী ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস বিভাগে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের বাদ দিয়ে চাকরি দেয়া হয়েছে অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩২তম স্থান পাওয়া আবদুর রহীমকে, পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজে নিয়োগ পেয়েছেন অনার্সে মাত্র ৪৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া নীরু বড়ুয়া। অবশ্য তার প্রধান যোগ্যতা হলো তিনি একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার স্ত্রী। পদার্থ বিজ্ঞানে বিজ্ঞাপনের শর্ত লঙ্ঘন করে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে স্বপন কুমার ঘোষকে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের হটিয়ে চাকরি পেয়েছেন অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত তাপস কুমার বিশ্বাস ও দেবদাস হালদার। এই ইন্সটিটিউটে ১১ জনকেই দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গোপালগঞ্জের আশরাফ সাদেক, কুমিল্লার এক কলেজের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহরিয়ার হায়দার, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে ইন্সটিটিউট থেকে একদা বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা মাহবুব রহমান এবং প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের আত্মীয় পরিচয়ে সুমেরা আহসান পুরোপুরি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন। এছাড়া প্রায় প্রতিটি বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের নির্লজ্জভাবে বঞ্চিত রেখে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে মেধা তালিকায় অনেক নিচের স্থান অধিকারীদের। এসব নিয়োগের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিবেকসম্পন্ন সিনিয়র অধ্যাপক আপত্তি জানিয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিলেও সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অবশ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজেই প্রায় সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত, তার মেধাবীদের প্রতি এক প্রকার ঈর্ষাপ্রসূত বিদ্বেষ থাকাটাই স্বাভাবিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি টেলিভিশনের অতি চেনা মুখ, বিশিষ্ট আওয়ামী 'বুদ্ধিজীবী' ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বাইরে বিটিভিসহ সব টিভি চ্যানেলে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে তিনি

www.pathagar.com

অহরহ জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন। এই বিশিষ্ট সুশীল (?) বুদ্ধিজীবীর শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে খানিক দৃষ্টিপাত করা যাক। ভদ্রলোক ১৯৬৯ সালে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গেই এসএসসি পাস করেছিলেন। সেই পরীক্ষায় খুলনার এক স্কুল থেকে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশ্যে বই খুলে গণটোকাটুকির এইচএসসি পরীক্ষায় অবশ্য তার একটি প্রথম বিভাগ রয়েছে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ঢাকা কলেজ থেকে পাসকোর্সে বিএসসি পাস করেন ১৯৭৫ সালে। রেজাল্ট সেই দ্বিতীয় বিভাগ। ১৯৭৬ সালে প্রিলিমিনারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বিভাগ থেকে আবারও দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত হন এবং শেষাবধি ওই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মাস্টার্স শেষ করেন ১৯৭৮ সালে। ১৯৮৫ সালে পিএইচডি করেছেন সব আওয়ামীর তীর্থভূমি ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এহেন দিকপাল চাকরি জীবন আরম্ভ করেছিলেন বুয়েটে PIO (Publication Information Officer) পদে।

বঙ্গবন্ধুর 'একনিষ্ঠ সৈনিক' বিস্ময়করভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগ পান। সেই সময় তার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা কোন দিকে ছিল, সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আশা করি, ভিসি মহোদয় মনে কষ্ট পাবেন না। ১৯৭২ সালে গণটোকাটুকির সুযোগ না পেলে যে ব্যক্তির জীবনে কোনো পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পাওয়ার সৌভাগ্য হতো না, তাকে শেখ হাসিনা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বানিয়েছেন। ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিবাদে সম্প্রতি আওয়ামী শিক্ষক ক্যাডার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ওহিদুজ্জামান চাঁন ভিসি প্যানেল নির্বাচনের জন্য উচ্চ আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছেন। উচ্চ আদালত থেকে এ ব্যাপারে রুলও ইস্যু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দলনিরপেক্ষ ও বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরাসহ দেশের আমজনতা সরকারি দলের এই গৃহবিবাদ ভালোই উপভোগ করছেন।

দেশের তাবৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে শিক্ষায় দুর্বল করে সক্ষমতায় পিছিয়ে দেয়ার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের দায়ভার বর্তমান সরকার বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদকেই বহন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী কেবল উচ্চ শিক্ষাতেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন না, বিগত তিন বছরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতেও আজগুবি ফলাফল বানিয়ে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

বর্তমান মন্ত্রিসভার গুটিকয়েক সৎ ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর নামও বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হয়ে থাকে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকাল এবং বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদের মন্ত্রিসভা ব্যতীত স্বাধীন বাংলাদেশের ৪১ বছরের অসংখ্য মন্ত্রীর মধ্যে সৎ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত ছিল সাবেক বামনেতা নূরুল ইসলাম নাহিদকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সততা কি কেবল টাকা-পয়সা না খাওয়া, নাকি নৈতিক সততা বলেও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে? শিক্ষামন্ত্রীর চোখের সামনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দলবাজ অযোগ্য ভিসিরা উচ্চ শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে চলেছেন, অথচ তিনি চোখ বুজে আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইঙ্গিতে ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে সর্বত্র অর্ধশিক্ষিত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর জন্য চাকরির বাজার খুলে দেশের শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হচ্ছে। এদিকে এসএসসি ও এইচএসসিতে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষার বাগাড়ম্বরে জিপিএ-৫ ও পাসের হারের উত্তরোত্তর যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে, তাতে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই সরকারের আমলে এ পর্যন্ত এসএসসির চারটি এবং এইচএসসির তিনটি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফলগুলো পর্যালোচনা করলেই যে কোনো সচেতন নাগরিক বুঝতে পারবেন আমাদের দেশপ্রেমবিবর্জিত বর্তমান সরকার জাতির জন্য কী ভয়ঙ্কর মরণ খেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পরীক্ষা	পাসের হার			
	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
এসএসসি	৭০.৮৯	৭৯.৯৮	৮২.৩১	৮৬.৩৭
এইচএসসি	৭২.৭৮	৭৪.২৮	৭৫.০৮	– –

এসএসসি পরীক্ষার সর্বশেষ ফলাফলে মন্ত্রীর নিজ বিভাগ সিলেটে ৯১ শতাংশ পাস করার যে রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে, তার সত্যতা নিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেক সাংবাদিকই বৃহত্তর সিলেট জেলার অধিবাসী। সেই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এই হঠাৎ মেধার বিস্ফোরণে তারাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে যে ডিজিটাল কারচুপির গুজব চারদিকে উথাপিত হচ্ছে, তাতে জনগণ অবস্থাদৃষ্টে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। আগেই উল্লেখ করেছি, আমি এসএসসি পাস করেছিলাম ১৯৬৯ সালে। যতদূর স্মরণে আছে, সেই বছর ঢাকা বোর্ডে মাত্র ৬৪ জন স্টার এবং ১৪০০ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আমাদের সবার মেধা বর্তমানের তুলনায় এতটাই নিম্নস্তরের ছিল মনে করলে লজ্জায় অধোবদন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ি। সেই সময়কার স্টারকে যদি বর্তমান সময়ের জিপিএ-৫ প্রাপ্তি সমতুল্য মনে করি, তাহলে ঢাকা বোর্ডে এবারের পরীক্ষায় স্টারপ্রাপ্তদের সংখ্যা ২৫০০০ ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের সময় ঢাকা কলেজ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হতো। ১৯৬৯ সালের এসএসসিতে যারা ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল, তারাই কেবল ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল। আজকে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের বিপুল সংখ্যা বিচার করলে তাদের মধ্যে কতজন এখনকার ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবেন সে প্রশ্ন এসেই যায়।

জিপিএ-৫ প্রাপ্তরাও যদি তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে না পারেন, তাহলে আর এই বিপুল নম্বর প্রাপ্তির সফলতা কোথায় রইল? নূরুল ইসলাম নাহিদের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে মনে হচ্ছে বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই তারা এসএসসিতে শতভাগ পাসের রেকর্ড গড়ে দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে চান! এসএসসিতে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা প্রতি বছর অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে নূরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছেন। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা কার স্বার্থে, সেটা শিক্ষামন্ত্রীই ভালো জানেন। তথাকথিত সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি যে প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে, তারা তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আন্তর্জাতিক সক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে কীনা, সেই আলোচনা আজ সর্বত্র। শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংসের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছেন, সেটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিপর্যয়কর হিসেবেই বিবেচনা করি।

আমি শিক্ষাবিদ নই, একজন কলামিস্ট ও সম্পাদক মাত্র। এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। বাংলাদেশের সব প্রবীণ, স্বনামধন্য শিক্ষাবিদরা এত বড় তুঘলকি কাণ্ড দেখেও বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করায় কিছুটা হতাশাও বোধ করছি। বিরোধী দল থেকেও এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না। কেবল অর্থকড়ির বিষয়ে সততা অবলম্বন না করে নূরুল ইসলাম নাহিদের প্রতি নৈতিক সততাও বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে এ সপ্তাহের লেখার ইতি টানছি। দেশের একজন নাগরিকের কর্তব্য বিবেচনা করেই আমার এই আহ্বান। আশা করি, শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর পরিণতিও সিলেট বিভাগেরই অপর সাবেক বাম নেতা, কালো বিড়ালখ্যাত সুরঞ্জিত বাবুর মতো হবে না।

১৬ মে ২০১২

www.pathagar.com

বেপরোয়া ফ্যাসিবাদের পুলিশি অ্যাকশন

বুধবারের নিয়মিত মন্তব্য প্রতিবেদন গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে মহাজোট সরকারের নজিরবিহীন চণ্ডনীতির প্রেক্ষিতে এগিয়ে আনতে হলো। এ দেশে প্রতি মুহূর্তে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। পুলিশের লাঠি শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে সব প্রতিবাদকারীর মাথায় বেধড়কভাবে বৃষ্টির মতো পড়ছে। ক্ষমতাসীনদের আচরণে পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, তারা দেশে কিংবা বিদেশে কোনো সমালোচনারই পরোয়া করেন না।

বিরোধী দলের চেয়ারপার্সন ব্যতীত সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় বিএনপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতাকে সরকার ইতোমধ্যে জেলে পুরেছে। তাদের মধ্য থেকে এক বিরাট অংশকে আবার কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি প্রিজনে বন্দি রাখা হয়েছে। আমি কাশিমপুর-২ জেলখানায় বন্দি থাকার সময় ওই কারাগারটি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। ওটা নাকি দুর্ধর্ষ সব জঙ্গি, টপটেরর ও ফাঁসির আসামিদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি সেলে সার্বক্ষণিক সিসিটিভির ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে বন্দিরা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ টয়লেট সম্পাদনের সময়ও কর্তৃপক্ষের নজরে থাকে। এমন একটি কারাগারে রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি রেখে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে হিটলারীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করছেন। ভেবে অবাক হতে হয় একটি সরকার কতখানি বর্বর হলে একজন রাজনীতিবিদকে গুম করেই ক্ষান্ত হয় না, তার অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অধিকতর আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর রাতে নির্লজ্জভাবে দলীয় ক্যাডারের ভূমিকা পালনকারী পুলিশ তার বাসস্থানে পাঠাতে পারে! বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে আওয়ামীপন্থী ও শেখ হাসিনার চাটুকার ছাড়া অন্যান্য নাগরিকের বসবাস করা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

বিরোধী দলকে সরকারের গুমের হুমকি

মেয়াদের সাড়ে তিন বছরের মাথায় এসে গণতন্ত্রের শতছিন্ন নেকাবটিও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকার। ক্ষমতার হোয়াইট ওয়াইন (সৈয়দ আশরাফের প্রিয় সোমরস) পানে মত্ত আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম

www.pathagar.com

বিরোধী দলকে সরাসরি এবার ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিয়েছেন। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দসহ ১৮ দলীয় জোটভুক্ত ৩৩ নেতার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে সিএমএম আদালত তাদের কারাগারে প্রেরণের দিনেই এক এগারোর আগে দেশবাসীর কাছে অপরিচিত এই আওয়ামী নেতা হুঙ্কার ছেড়েছেন। মন্ত্রীর চেয়ারে বসে এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা যায় কীনা, সেই প্রশ্ন কোনো আওয়ামী লীগারকে করে একেবারেই ফায়দা নেই। অন্যদের কথাবার্তা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে কেবল দলটির সভানেত্রীর সংসদের ভেতরে-বাইরে বচন শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।

তাই শালীনতার প্রসঙ্গ টেনে না এনে আমি বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছি। আইন প্রতিমন্ত্রীর হুমকি প্রদানের দিনেই সাহারা খাতুনের পুলিশ উচ্চ আদালতের এক রুলের জবাবে সোজা বলে দিয়েছে দেশপ্রেমিক, লড়াকু বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী তাদের হেফাজতে নেই। অর্থাৎ ইলিয়াস আলীর পরিণতিও চৌধুরী আলমের মতোই হতে চলেছে। কামরুল ইসলামের হুমকির সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই জবাব গভীরভাবে সম্পর্কিত। ঔদ্ধত্য এবং অশালীন আচরণ ও কথাবার্তার জন্য দেশবাসীর কাছে সবিশেষ পরিচিত আইন (!) প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন মতের সব নাগরিকের ইলিয়াস আলীর ভাগ্য বরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ পছন্দের ব্যক্তি হিসেবে তিনি অবশ্যই জানেন র‍্যাব ও বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক একমাস আগে অপহৃত ইলিয়াস আলীর ভাগ্যে এতদিনে কী ঘটেছে। আইন প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্যে প্রকৃতপক্ষে পুরো বিরোধী দলকেই গুমের হুমকি দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক আইনে (Rome Statute of the International Criminal Court) গুম (enforced disappearance) একটি গুরুতর অপরাধ। ২০০২ সালের ১ জুলাই এই আইনটি গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সব সদস্য রাষ্ট্রে গুম প্রতিরোধে International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance শিরোনামে কঠোর নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে গুমের ভয়াবহতার বিষয়ে এ বছর ২০ এপ্রিল বিবিসি "Enforced disappearances haunt Bangladesh" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর ২০১২ সালের রিপোর্টের নিম্নোক্ত লাইনগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে, Although the numbers of RAB killings has dropped following domestic and international criticism. there was a sharp increase in enforced disappearances.

www.pathagar.com

leading to concerns that security agencies have replaced one form of abuse with another.

(অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে র‍্যাব কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা হ্রাস পেলেও, গুমের ঘটনার লক্ষ্যণীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ এক ধরনের গর্হিত আচরণকে অন্য প্রকার গুরুতর অন্যায় দ্বারা বদল করেছে।)

আইন প্রতিমন্ত্রীর সর্বশেষ হুমকি বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ রূপে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতসমূহে তুলে ধরা যেতে পারে। নানারকম আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসীন মহাজোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রযন্ত্রের নজিরবিহীন অত্যাচার, নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করেও আমি আশাবাদী যে ইন্‌শাআল্লাহ্, একদিন ক্ষমতাসীন নীতিনির্ধারকদের মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আন্ত র্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। গুম হয়ে যাওয়া যে কোনো নাগরিকের পরিবারের সদস্য এই মামলা দায়ের করতে পারেন এবং পারবেন। এটা কখনও তামাদি হবে না। ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভয়াবহ পরিণতির হুমকিদাতারা বিষয়টি স্মরণে রাখলে উপকৃত হবেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনে আদালতের দায়

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাংলাদেশে চরম নিবর্তনমূলক একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল' চালু করেছিলেন। একই বছরের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে তার হত্যার সঙ্গেই সেই চরমভাবে গণধিকৃত শাসন ব্যবস্থার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। একজন স্বৈরশাসকের মতোই ১৯৭৪ সালের ১৬ জুন বাংলাদেশের তাবৎ সংবাদপত্র আইন করে তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে একটি বিষয়ে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করতে হবে। তিনি আদালতের কার্যক্রমের ওপর তেমন হস্তক্ষেপ করেননি। ফলে রক্ষীবাহিনী অধ্যুষিত বাংলাদেশের জরুরি আইনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও উচ্চ আদালত অনেক সাহসী রায় দিয়ে খানিকটা হলেও ফ্যাসিবাদের রাশ টানার চেষ্টাটা অন্তত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য সেই সময়ের সম্মানিত বিচারপতিরা উচ্চ মানবিকতাবোধ ও বিবেকসম্পন্ন হওয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও তৎকালীন দুর্বিনীত শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন।

www.pathagar.com

মাজদার হোসেন মামলা নিয়ে এদেশে এক সময় প্রচুর গলাবাজি শুনেছি। সেই মামলার রায়ের আলোকে ভারতপন্থী ও আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং সেনাবাহিনী সমর্থিত মইন-ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাগজে-কলমে বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণা নিয়ে সেই সময়ের সুশীল (?) পত্রিকাসমূহের প্রচারণা চোখে পড়ার মতো ছিল। তাদের প্রচারণায় মনে হচ্ছিল, আইনের শাসন কায়েম হয়ে বাংলাদেশ যেন হিন্দু পুরাণের 'সত্যযুগে' ফিরে গেছে। বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একাধিক প্রকল্পও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আজকের বিচার বিভাগ বাংলাদেশের ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক মাত্রায় দলীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দেশের বিবেকসম্পন্ন সব বিশিষ্ট আইনজীবী একবাক্যে বলছেন, এদেশে ন্যায়বিচার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন, হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালার বালাই নেই। কেবল দলীয় বিবেচনায় গত সাড়ে তিন বছরে উচ্চ আদালতে রেকর্ডসংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছেন। সব বেঞ্চেই সিনিয়র বিচারপতিদের সঙ্গে একজন করে সম্প্রতি নিয়াগপ্রাপ্ত জুনিয়র বিচারককে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে বিভক্ত রায় দেয়ার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড করে বাংলাদেশের নাম গিনেস বুকে ওঠানোর বন্দোবস্ত সম্পন্ন প্রায়। অধিকাংশ রাজনৈতিক মামলায় পূর্বেকার রীতিনীতি (Convention) ভঙ্গ করে জুনিয়র বিচারপতিরা যাদের চাকরি এখনও 'কনফার্মড্' (Confirmed) হয়নি, তারাও অম্লান বদনে সিনিয়র বিচারপতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে চলেছেন। কোর্ট রিপোর্টারদের কাছ থেকে শুনেছি, এসব মামলায় বিশেষ চিরকুট পকেটে নিয়েই নাকি এ নবীন বিচারপতিরা এজলাসে ওঠেন। শুনানি শেষে সিনিয়র বিচারপতির রায় প্রদান সমাপ্ত হলে সেই চিরকুট দেখে বিভক্ত রায় ঘোষণা করা হয়।

গত সপ্তাহে সিএমএম আদালতে যে কাণ্ড ঘটল, তার মাধ্যমেও বিচার বিভাগের তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ পুনর্বার উন্মোচিত হয়েছে। যে মামলায় সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী, বিএনপি দলীয় এমপি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনকে সিএমএম কোর্ট আগেই জামিন দিয়েছে, সেই একই মামলায় বিস্ময়করভাবে দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবসহ ৩৩ জন অভিযুক্তের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মধ্যরাতের টক শো'তে নিয়মিত অতিথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল তৃতীয় শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা সংক্রান্ত এক মন্তব্য করায় তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত হয়ে হাইকোর্টে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। সুশীলরা (?) মোটামুটি তার পক্ষে থাকায় এখনও জেলে যেতে না হলেও নিয়মিত উচ্চ

www.pathagar.com

আদালতে হাজির হয়ে নানা রকম অবমাননাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন জনপ্রিয় এই অধ্যাপক, কলামিস্ট ও টেলিভিশন স্টার। অথচ মহাজোট সরকারের নেতা ও মন্ত্রীরা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই অহরহ এই অভিযোগ আনছেন যে, তারা নাকি ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে অসাংবিধানিক কোনো তৃতীয় শক্তিকে ক্ষমতায় আনার চক্রান্ত করছে।

মাত্র দু'দিন আগে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তো দেশে এক এগারোর চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সেসব মহাশক্তিধরের বিরুদ্ধে কোনো আদালত এখন পর্যন্ত সুয়োমোটো রুল জারি করেননি। আইন সব নাগরিকের জন্য সমান, সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের বাস্তবতায় এখন শুধু কল্পকথাই। এদেশে চেহারা দেখে যে আইনের প্রয়োগ হয়, সেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি আদালত অবমাননা মামলাতেই প্রত্যক্ষ করেছি। আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এমএ মতিনের 'below contempt' তত্ত্ব এখনও কানে বাজে। বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতির দায় তাই বিচার বিভাগ এড়িয়ে যেতে পারে না। বিচার বিভাগের দায়িত্বহীনতার কারণেই শ্রমিক নেতা বাকির হোসেন অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছেন, সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এমইউ আহমেদকে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে, রিমান্ডের নামে দলবাজ র‍্যাব-পুলিশ কর্মকর্তারা নির্যাতনের লাইসেন্স পেয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শত শত বানোয়াট মামলায় একচেটিয়াভাবে জামিন নামঞ্জুর করে অভিযুক্তদের রিমান্ডে পাঠানো হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে বিচার বিভাগকেও এসব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি ভবিষ্যতে করতে হবে।

মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের ডিজিটাল কায়দা

যাই হোক, পিতা ও কন্যার শাসন পদ্ধতির তুলনায় ফিরে যাই। কন্যা বুঝতে পেরেছেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সব সংবাদ মাধ্যম বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি তাই উদাহরণ সৃষ্টি করে অন্যদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বেশুমার পত্রিকা ও চ্যানেলের মধ্য থেকে মাত্র একটি-দু'টি পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলকে বেছে নিয়েছেন। আমার দেশ বন্ধ করেছিলেন, শীর্ষ কাগজ ও চ্যানেল ওয়ান বন্ধ করে দিয়েছেন, যমুনা টিভিকে লাইসেন্স দেননি, একুশে টিভির ওপর নানা পদ্ধতিতে আক্রমণ এখনও চলছে। আমিসহ মাত্র চারজন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্পাদককে জেল ও রিমান্ডে নিয়েছেন। তাতেই দেখুন, কাজের কাজটি হয়ে গেছে। বিটিআরসি কর্তৃক সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়ার আশঙ্কায় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কয়েকটি টকশো ব্যতীত প্রবলভাবে সরকারের তোষামোদ করে চলেছে। সেই

www.pathagar.com

টকশোগুলোতে আবার অতিথি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের অলিখিত নিষেধাজ্ঞা বিনা প্রতিবাদে পালন করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাভিশনের এক মজার গল্প বলি। সেই চ্যানেলে মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ফ্রন্ট লাইন নামে এক আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। বাংলাভিশনের একজন প্রযোজক মাস তিনেক আগে আমাকে টেলিফোনে সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। সঙ্গে আরও বললেন, আমার বিপরীতে থাকবেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং নব্য ব্যাংকার ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর। নির্ধারিত রেকর্ডিংয়ের দিন সকালে আকস্মিকভাবে আমাকে জানানো হলো, উপস্থাপক মতিউর রহমান চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ থাকায় রেকর্ডিং করা যাচ্ছে না। প্রচুর বিনয় সহকারে ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, পরের সপ্তাহেই অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হবে। বলাই বাহুল্য সেই পরের সপ্তাহ আজ পর্যন্ত আসেনি। আরও তাজ্জবের বিষয় হলো, 'অসুস্থ' উপস্থাপককে আমি কিন্তু নির্ধারিত দিনে অন্য দুই অতিথি নিয়ে যথারীতি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে দেখেছি।

সরকারিভাবে ঘোষণা দিয়ে মিডিয়া বন্ধ না করেও কতটা কার্যকরভাবে সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এই মেয়াদে তার চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ক্ষেত্রেও আদালত তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। টেলিভিশনে সরকারকে সমালোচনা করতে গেলেই কথা বলার সময় মাথার ওপর সুয়োমোটো রুলের ঝুলন্ত তরবারির কথা স্মরণ করে অতিথিবৃন্দকে কথা গিলে ফেলতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ড. আসিফ নজরুলের উদাহরণ খানিক আগেই দিয়েছি। একুশের উপস্থাপক অঞ্জন রায় এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খানও উচ্চ আদালতে অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন। সম্প্রতি সরকারের সঙ্গে নিজ, পৈতৃক ও শ্বশুরের পরিবারসহ অতিঘনিষ্ঠ, দেশের জনপ্রিয়তম কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদও তার উপন্যাসে কী লিখবেন, সে বিষয়ে আদালত রুল জারি করেছে। সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংবাদপত্রে রিপোর্টিংয়ের বিষয়েও একই স্থান থেকে নির্দেশনা এলেও সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে নির্দেশ প্রদানকারী মহামহিম বিচারপতি শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে চিন্তা, লেখা, কথা বলা এবং গণমাধ্যমের আর কোনো স্বাধীনতা অবশিষ্ট নেই।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দুর্নীতিবাজ ক্ষমতাসীনদের এমন নগ্ন ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠার কথা ছিল,

www.pathagar.com

সেটি এখন পর্যন্ত হয়নি। সুশীল (?) সমাজের আপসকামিতা ও জনগণের ভীরুতার পাশাপাশি বিরোধী দলের বিভ্রান্তিকর রাজনীতিও এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। বিরোধী দলের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেই আজকের লেখায় ইতি টানব।

বিরোধী নেতৃবৃন্দের পলায়ন কৌশল

যে বানোয়াট মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিরোধী জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কারাগারে গেছেন, সেই মামলাটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের মাত্র চারদিন আগে দায়ের করা হয়েছিল। ইলিয়াস আলী গুমের প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় সার্বিক পরিস্থিতি তখন ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাড়ে তিন বছরের অপশাসনে পিষ্ট জনগণ ঊনসত্তরের মতো গণআন্দোলনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা এমন সময় বিএনপি চেয়ারপার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হিলারি ক্লিনটনের সফরকালে আন্দোলন স্থগিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দও মার্কিন সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাকে আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধের পরামর্শ দেন।

বিএনপি'র তখন শাঁখের করাত অবস্থা। নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতারের আশঙ্কা। আর গ্রেফতার হলে হরতাল না দিলে ইজ্জত থাকে না। ওদিকে আবার আন্দোলন বন্ধের বিদেশি চাপ। সুতরাং, দল থেকে সিদ্ধান্ত হলো দলবেঁধে পলায়নই উত্তম। বাঘা বাঘা আইনজীবীরা ভরসা দিলেন, উচ্চ আদালত থেকে জামিন প্রাপ্তি এক-দু'দিনের ব্যাপার মাত্র। আর উচ্চ আদালত একবার জামিন দিলে কি নিম্ন আদালত সেটা কাটার সাহস দেখাবে? এসব বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জ্ঞানী আইনজীবী এখনও বোধহয় শেখ হাসিনাকে ঠিকমত চিনে উঠতে পারেননি। রিজভী আহমেদ ব্যতীত সব নেতা পালালেন এবং বিএনপি আন্দোলনে বিরতি দিল।

হিলারি ক্লিনটন এবং প্রণব মুখার্জি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিরোধী দলের পুলকিত হওয়ার মতো প্রকাশ্যেই অনেক কিছু বললেন। চেয়ারপার্সনের পরামর্শদাতারা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে ভাবতে লাগলেন, নাগালের মধ্যেই রাষ্ট্র ক্ষমতা। হাইকোর্টে কয়েকদিনের জন্য আগাম জামিন প্রাপ্তি তাদের সন্তুষ্টির পারদ আরও ওপরে তুলল। শেষ হাসি অবশ্য হাসলেন মাহবুবুল আলম হানিফ, কামরুল ইসলাম, সাহারা খাতুন, শামসুল হক টুকু এবং অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পলায়নের রাজনৈতিক কৌশল সরকারের

www.pathagar.com

আদালতি কৌশলের কাছে চরমভাবে মার খেল। বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে ঠিকই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলের ভাত খেতে হচ্ছে। উপরি হিসেবে কপালে জুটছে নানা মহলের কটাক্ষ ও নিন্দাবাদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার পরিণতিতে বিএনপিকে আবার গোড়া থেকে আন্দোলন শুরু করতে হবে। মাঝখান থেকে দেশ-বিদেশে প্রবল সমর্থনপ্রাপ্ত ইলিয়াস গুম ইস্যুকে পেছনে ঠেলে সামনে আনতে হচ্ছে দলীয় নেতা-কর্মীদের জামিন ও মামলা থেকে অব্যাহতির দাবি। কত নির্যাতন, কত জেল-জুলুম, কত প্রাণ বিসর্জন, কত রক্ত ক্ষয়ের বিনিময়ে ইলিয়াসকে ফিরিয়ে দেয়ার ন্যায্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার পর কেবল বিদেশিদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই আন্দোলনের গতি শ্লথ করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বিএনপি'র জন্য শেষ পর্যন্ত কতটা বিপর্যয়কর হয়, সেটা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

মামলা দায়েরের পর যদি বিএনপি নেতৃবৃন্দ দলের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে তাদের গণগ্রেফতারের জন্য সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন, তাহলে ক্ষমতাসীনদের গদি নড়ে ওঠার সম্ভাবনাই অধিক ছিল বলে আমার ধারণা। হিলারি ক্লিনটনের সফরের সময় দেশের অবস্থা স্থিতিশীল রাখার দায়িত্ব সরকারের ছিল, বিরোধী দলের নয়। এ কথাটা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলে বিএনপির তাতে কোনো ক্ষতি হতো না। আজকের ক্ষমতাসীনরা বিএনপি জোট সরকারের আমলে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের সফরের দিনে হরতাল পালন করেছিল। তাতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে একতরফা মার্কিন সমর্থন পেতে আওয়ামী লীগের কোনো অসুবিধা হয়নি। যে বিদেশিরা আন্দোলন স্থগিত করার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে চাপ দিয়েছিলেন, তারা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মুক্তির জন্য পর্দার আড়াল থেকে কোনোরকম কার্যকর ভূমিকা রাখছেন কীনা, তা আমার জানা নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বারিধারার দূতাবাসসমূহে ধর্না দেয়ার চেয়ে জনগণ ও আল্লাহ্‌র শক্তির ওপর নির্ভর করতেই পছন্দ করি।

সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যেও আমি দীর্ঘ মেয়াদে চূড়ান্ত বিজয়ের আশা ছাড়তে রাজি নই। ইতিহাসের শিক্ষা হলো, সব স্বৈরশাসককে তার অপকর্মের জন্য এক সময় মূল্য দিতে হয়। তারা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই নিক্ষিপ্ত হন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পরিবারের ট্র্যাজেডির জন্য দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে জনসমক্ষে অবিরত অশ্রুপাত করে চলেছেন। সেই ট্র্যাজেডির সঙ্গে সম্পৃক্তদের ফাঁসি দেয়ার পরও তার অশ্রুর বন্যা শেষ হয়নি। এই সেদিনও তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৩১তম বার্ষিকীতে নিহত পিতা-মাতা, ভাইদের কথা স্মরণ করে

www.pathagar.com

তাকে কাঁদতে দেখলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও অনেককেই চোখ মুছতে দেখা গেল। অথচ এই একই শেখ হাসিনা সাগর-রুনির হত্যা এবং ইলিয়াস আলীর গুম নিয়ে যখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, তখন রবার্ট লুই স্টিভেনসনের লেখা কালজয়ী ইংরেজি উপন্যাস ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)-এর কথা স্মরণে এসে যায়। তিনি সাগর-রুনির এতিম পুত্র, ছয় বছরের মেঘ এবং ইলিয়াসের সাত বছরের কন্যা সাইয়ারা নাওয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান, অথচ খুনিকে খোঁজার ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ নেই কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি ইলিয়াসকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো নির্দেশও তার কাছ থেকে আসে না। উল্টো ইলিয়াসের পরিবারকেই এখন মধ্যরাতে পুলিশ পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

সরকারের বিশেষ খুনেবাহিনী একের পর এক গুম করবে, আর দয়াশীল প্রধানমন্ত্রী এতিমদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে থাকবেন, এমন বীভৎস রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করতে চাই না। মাত্র দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী দম্ভোক্তি করেছেন, বিরোধী দলকে কীভাবে সোজা করতে হয় আমি জানি। তিনি আরও বলেছেন, তার সহ্য করার ক্ষমতাকে যেন দুর্বলতা মনে করা না হয়। বিগত সাড়ে তিন বছরের গুম, হত্যা, নির্যাতনের শাসনকাল যদি সহ্যের নমুনা হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে কি মৃত্যুপুরীতে পরিণত করার আয়োজন চলছে? আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় সন্ত্রাসী হামলা কি প্রধানমন্ত্রীর সেই হুমকির বাস্তবায়ন? শেকস্‌পিয়রের নাটক রিচার্ড-থ্রি (Richard-III) থেকে একটি ক্ষুদ্র অথচ অসাধারণ বাক্য উদ্ধৃত করে দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে হৃদয়ভরা বেদনা নিয়ে আজকের মন্তব্য-প্রতিবেদন সমাপ্ত করছি। শেকস্‌পিয়র লিখেছেন– "Bloody thou art, bloody will be thy end."

(যত তুমি রক্ত ঝরাবে
অন্ত তোমার ততই রক্তাক্ত হবে)।

২০ মে ২০১২

www.pathagar.com

গণতন্ত্রবিনাশী পঞ্চদশ সংশোধনী

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিরঙ্কুশ এবং চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করেছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব সুযোগ রহিত করার ফলেই পরবর্তী সময়ে এ দেশে ১৫ আগস্টের মতো ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ না করে তার কন্যা পিতার মতো করেই সংসদে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানের ১৫ নম্বর সংশোধনী পাস করিয়েছেন। এই সংশোধনীর ফলে আমাদের সংবিধান সর্বতোভাবে গণবিরোধী চরিত্র ধারণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিম্নশ্রেণীর চাটুকার ব্যতীত সমাজের সব অংশ দ্বারা এর মধ্যে পঞ্চদশ সংশোধনী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী নাগরিকবৃন্দের কাছে এই সংশোধনী যে গ্রহণযোগ্য হবে না, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আওয়ামী লীগের আদর্শিক মিত্র বাংলাদেশের সেক্যুলার গোষ্ঠীও বর্তমান সংবিধানকে গণবিরোধী বলছেন। তাদের আপত্তি মূলত দু'টি স্থানে। প্রথমত, আল্লাহর প্রতি আস্থা মহাজোট সরকার সংবিধানের মূল নীতি থেকে বিসর্জন দিলেও সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রেখে দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, ১৯৭২ সালের বাঙালি জাতীয়তাবাদ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পুনঃপ্রবিষ্ট করানোর ফলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ পুনর্বার প্রজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কায় সেক্যুলার গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়েছে। তবে সংবিধানের ধর্মীয়, জাতিগত অথবা ভাষাগত অসঙ্গতির বিষয়ে আজ আমি লিখতে বসিনি। পঞ্চদশ সংশোধনী যে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মতো রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করেছে, সেটাই আজকের মন্তব্য প্রতিবেদনের মূল বিষয়। সেই কারণে আমার আলোচনা কেবল পঞ্চদশ সংশোধনীর ৭ এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

সংবিধানের ৭ ধারার দুটো অংশ রয়েছে। ৭ (ক) ধারার শিরোনাম হলো, 'সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।' এখানে বলা হয়েছে–

www.pathagar.com

"৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। (১) কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায়–

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে–

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ভবিষ্যতে সামরিক অভ্যুত্থান প্রতিহত করার মহৎ উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রায় একদলীয় সংসদ এই সংশোধনী গ্রহণ করেছে। সমালোচকরা তর্ক করতে পারেন, আইন করে কোনো দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকানো যায়নি। সব ক্ষেত্রে সংবিধান স্থগিত করেই বন্দুকধারীরা ওই কর্মটি সম্পাদন করেন। আগুয়ান ট্যাংকের সামনে এক কপি সংবিধান উঁচিয়ে ধরে বিশ্বের কোথাও সামরিক অভ্যুত্থান আটকানো যায়নি। নব্বই'র দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ইয়েলৎসিন ট্যাংকে আসীন হয়ে যে নাটক করেছিলেন, তার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমর্থনের পাশাপাশি সম্ভবত ভদকা'র যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্ত-পরবর্তী রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের মদ্যপ্রীতি নিয়ে প্রচুর মজার গল্প আছে। যাই হোক, সংবিধান দিয়ে প্রকৃতই সেনা অভ্যুত্থান প্রতিহত করা যায় কিনা, আমি সে তর্কে যাচ্ছি না। আমার মূল আপত্তি ৭ক (১)-এর 'খ' অংশ নিয়ে। সংবিধানের কোনো গণবিরোধী কিংবা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী অংশের বিরুদ্ধে নাগরিককে সচেতন করার যে কোনো উদ্যোগকে সরকার ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতারূপে গণ্য করতে সক্ষম হবে, এ জাতীয় অনুচ্ছেদ কেবল একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের সংবিধানেই থাকতে পারে। আওয়ামী লীগের মতো চরিত্রগতভাবে ফ্যাসিবাদী দলের নীতিনির্ধারকদের মাথা থেকেই জনগণের চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণকারী এ ধরনের কালো আইন জন্মলাভ করতে পারে। এখানেই শেষ নয়। একই অনুচ্ছেদের ৭ক(২) আরও ভয়াবহ। ওই অংশটি উদ্ধৃত করা যাক–

"কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত–

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে–

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।"

www.pathagar.com

সর্বশেষ উদ্ধৃত আইনটির বাস্তবে প্রয়োগ কল্পনাতে আনার চেষ্টা করছি। ধরা যাক, বিরোধী দলের এক জনসভায় একজন বক্তা পঞ্চদশ সংশোধনীর তুঘলকি আইনের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিলেন এবং উপস্থিত কয়েক লাখ মানুষ (বেগম খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক রোডমার্চগুলোতে ন্যূনতম পাঁচ লাখ কর্মী, সমর্থক, শ্রোতার সমাগম হয়েছিল) স্লোগান কিংবা করতালির মাধ্যমে সেই সমালোচনাকে সংবিধানের ভাষায় 'অনুসমর্থন' দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ প্রণীত পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সেই জনসভায় উপস্থিত লাখ লাখ মানুষের প্রত্যেককেই সেই 'অনুসমর্থনের' অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব। আমাদের তথাকথিত স্বাধীন নিম্ন ও উচ্চ আদালতের যে অবস্থা, তাতে অ্যাটর্নি জেনারেল মামলা পরিচালনা করলে সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা করে প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝোলাতে সরকারের কোনো সমস্যাই হবে না। অনুচ্ছেদ ৭ক (৩) এ সর্বোচ্চ সাজার ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে–

"এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" বাংলাদেশ পেনাল কোডে সর্বোচ্চ দণ্ড, মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ কেবল বিরোধী দলের জনসভায় উপস্থিত থাকার অপরাধে বাংলাদেশের পঞ্চদশ সংশোধনীত্তোর ফ্যাসিস্ট সংবিধান অনুযায়ী এ দেশের নাগরিকদের তাত্ত্বিকভাবে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কোনো যেন তেন ফ্যাসিস্টের পক্ষে এ জাতীয় ঘৃণ্য আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান শাসকশ্রেণীর মতো তাকে অবশ্যই বিকৃত মস্তিষ্ক এবং স্যাডিস্ট হতে হবে।

এবার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ বোঝার চেষ্টা করছি। পঞ্চদশ সংশোধনীর ৭(খ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

"৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।– সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।"

অর্থাৎ শেখ হাসিনার হুকুম অনুযায়ী পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন বাংলাদেশের এই আইন অপরিবর্তনীয়। ভবিষ্যতের সব নির্বাচিত সংসদকে বর্তমান মহাজোট সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ক্ষমতার মদিরা অথবা

www.pathagar.com

হোয়াইট ওয়াইন আকণ্ঠ পান করে একেবারে বেহেড মাতাল না হলে এভাবে ভবিষ্যতের মানুষদেরও নিয়ন্ত্রণ করার কল্পনা কারও মাথায় আসার কথা নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এভি ডাইসি (AV Dicey) সংসদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে লিখেছেন, "The principle of Parliamentary sovereignty means neither more nor less than this; that Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law whatever, and, further that no person or body is recognised by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament."

(সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অর্থ এর চেয়ে বেশি বা কম নয়; ইংলিশ সংবিধানে সংসদকে আইন প্রণয়ন এবং বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘ ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী সংসদে প্রণীত কোনো আইনকে বাতিলের ক্ষমতা রাখে না)। সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিষয়ে এভি ডাইসির থিসিস থেকে মূল নীতি হিসেবে দু'টি বিষয় গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা এবং রাষ্ট্রের যে কোনো বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

(২) কোনো সংসদ অতীতের কোনো সংসদের কাছে দায়বদ্ধ নয় এবং ভবিষ্যতের কোনো সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতাও সীমিত করতে পারে না।

এভি ডাইসির অন্য অনেক মন্তব্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে বিশ্বের পণ্ডিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দ্বিমত পোষণ করলেও উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে তারা প্রায় সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ৭(খ) অনুচ্ছেদ পৃথিবীর সব সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চাকারী রাষ্ট্রে অনুসৃত ডাইসির মতবাদের সরাসরি লঙ্ঘন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার চরম স্বৈরাচারী মানসিকতার কারণে কেবল বর্তমানের ওপরই প্রভুত্ব করতে চাচ্ছেন না, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশের সব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, আদর্শকে পদানত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে একাদশ শতাব্দীর অতীব অহঙ্কারী ভাইকিং রাজা ক্যানিউটের (King Canute) কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই রাজা নাকি মনে করতেন, প্রজারা তো নস্যি, সমুদ্রের ঢেউও তার আদেশ মেনে চলবে। হাজার বছর পরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও রাজা ক্যানিউটের রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চাটুকার পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন না যে, পিতার মতো পারিষদবর্গ তাকেও গণবিচ্ছিন্ন করে ক্রমেই ট্র্যাজেডির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

আজীবন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রাখার অসুস্থ ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই যে বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংবিধান থেকে ছেঁটে ফেলেছে, সেটা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও বুঝতে পারেন। কিন্তু সেই দুষ্কর্মটি করতে গিয়ে ৪৪ নম্বর আইনের নামে কতখানি হাস্যকর, অবাস্তব, আজগুবি ও স্ববিরোধী আইন জনগণের মাথায় যে চাপানো হয়েছে, সেটা বোধহয় এ দেশের অধিকাংশ নাগরিক এখন পর্যন্ত ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। ৪৪ নম্বর আইনের মাধ্যমে সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আলোচনার আগে আইনটি উদ্ধৃত করছি–

"৪৪। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।–সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।"

উদ্ধৃত আইনটির স্ববিরোধিতার বিষয়টি এবার বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি। বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২০১৪ সালের ২৫ জানুয়ারি। সুতরাং সংশোধিত ১২৩(৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে ২৬ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৪-এর মধ্যবর্তী যে কোনো একদিন। শেখ হাসিনার সরকার যদি কোনো কারণে মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারে, তাহলে অবশ্য ১২৩ (৩)(খ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। এ তো গেল পরবর্তী নির্বাচন কবে হবে না হবে, সে সংক্রান্ত আলোচনা। আজগুবি অংশটি আসছে, এরপর যেখানে বলা হচ্ছে বর্তমান সংসদের মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে জয়লাভ করা নতুন সংসদ সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন না।

ধরা যাক, আগামী বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। তার আগে তীব্র গণঅসন্তোষের কারণে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল না হলে প্রধানমন্ত্রীসহ সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা এবং নবম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের সময় পূর্ণ ক্ষমতায় থাকবেন। এটা খুবই সম্ভব যে বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে অন্তত একটি অংশ সেটা যতই ক্ষুদ্র হোক, আগামী

www.pathagar.com

নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাবেন না। সুতরাং, তাদের জায়গায় নতুন ব্যক্তিরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ একটি নির্বাচনী এলাকায় দু'জন সংসদ সদস্য অন্তত কিছুদিনের জন্য থাকছেন। সেই কিছুদিন কতটা দীর্ঘ হবে, সেটি নির্ভর করবে একচ্ছত্র রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছার ওপর। তিনি যদি মেয়াদের একেবারে শেষদিন পর্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করতে চান, তাহলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পরবর্তী প্রায় একমাস দু'জন সংসদ সদস্য একই এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'এক ঘর মে দো পীর'-এর এক বাস্তব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে উচ্চ দ্রব্যমূল্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্যাতনে পিষ্ট জনগণকে সম্ভবত বিমলানন্দ দিতে চাচ্ছেন!

আর যদি এমন হয় যে, কোনো মন্ত্রী মহাজোট থেকে মনোনয়ন পেলেন না, তাহলে তো পরিস্থিতি একেবারে সোনায় সোহাগা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যার কিছুমাত্র ধারণা রয়েছে, তিনিই বুঝবেন মনোনয়নবঞ্চিত মন্ত্রী তার এলাকায় কেমন তাণ্ডব সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। সম্প্রতি গফরগাঁওয়ে সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন (অব.) গিয়াসউদ্দিনকে হিন্দি সিনেমার স্টাইলে তারই এলাকার জনগণকে লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করতে দেখা গেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকারীদের অন্যতম এই ব্যক্তি আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না পেলে মেশিনগান নিয়ে যে ময়দানে নামবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর মধ্যে এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং, সংবিধানকে বর্তমান অবস্থানে রেখে কোনো সুষ্ঠু, পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যে বাংলাদেশে সম্ভব নয়, সেটি পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে গণতন্ত্রকে কবর দিয়েছিলেন চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করে। তার সুযোগ্য কন্যা দ্বিতীয়বার গণতন্ত্র নির্বাসনে পাঠিয়েছেন পঞ্চদশ সংশোধনী গ্রহণের মাধ্যমে। তাই পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল আজ জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশাসনের চণ্ডনীতি থেকে আমার কাছে অন্তত মনে হচ্ছে না যে, তিনি জনদাবির প্রতি কোনোরকম শ্রদ্ধা দেখাবেন। বিরোধী দলের দুর্বল ও বিভ্রান্ত আন্দোলন তাকে ক্রমেই দুর্বিনীত করে তুলছে।

পুলিশ, র‍্যাব, এসএসএফের নাকের ডগায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে বাস পোড়ানো মামলায় বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ ৩৩ জন নেতাকে অভিযুক্ত করে জেলে পাঠানো সরকারের চরম

www.pathagar.com

অসহিষ্ণু আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের কর্মীরা শেরাটন হোটেলের সামনে বাসে আগুন দিয়ে ৭ জন যাত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তখন দলটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আজকের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। আওয়ামী লীগের বর্তমান সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের কোনো সরকার কর্তৃক গাড়ি পোড়ানো এবং মানুষ হত্যার অপরাধে রাষ্ট্রপতিসহ দলের অন্যান্য নীতি-নির্ধারকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের হওয়া বিচিত্র নয়। আইনজীবীদের কাছ থেকে শুনেছি, ফৌজদারি মামলা কখনও তামাদি হয় না। এছাড়া টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দিনে-দুপুরে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যার অপরাধ তো আছেই। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দলীয় নেতা-কর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং শেখ হাসিনা।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময় থেকে দৃশ্যতই বিরোধীদল দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচি দেয়া থেকে বিরত থাকছে। দলটি নতুন করে ক'দিন আগে গণঅনশন কর্মসূচি পালন করেছে। পাঠকের স্মরণে থাকার কথা, গত বছর জুলাই মাসেও তারা একই প্রকার কর্মসূচি পালন করেছিল। একমাত্র পার্থক্য হলো, এবার অনশনস্থল ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট চত্বরের পরিবর্তে মহানগর নাট্যমঞ্চে স্থানান্তরিত হয়েছে। এদিকে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলের অন্যতম নীতিনির্ধারক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ অব্যাহতভাবে বলে চলেছেন, তারা নাকি সরকারের সব নির্যাতন আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে মোকাবেলা করবেন। দলটির প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে একাংশ সাংবিধানিক আন্দোলনেরও থিওরি দিচ্ছেন।

যে দেশে ক্ষমতাসীনরা সংবিধানকে নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা করছেন, নিম্ন-উচ্চ নির্বিশেষে সম্পূর্ণ বিচার বিভাগ দলীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেই দেশে আইনি লড়াই এবং সাংবিধানিক আন্দোলনের মাজেজা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। এ জাতীয় বক্তব্য দিয়ে সুশীল (?) সমাজ এবং বিদেশি মুরব্বিদের কাছ থেকে বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। বিরোধী দল হয়তো আশা করছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে শেখ হাসিনা সংবিধান পুনর্বার সংশোধনে সম্মত হবেন। আমি সবিনয়ে তাদের প্রফেসর ইউনূস উপাখ্যান স্মরণে আনতে অনুরোধ করছি।

মার্কিন পত্রিকা 'ইউএসএ টুডে'তে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন তার অতি পছন্দের ব্যক্তিদের তালিকায় প্রফেসর ইউনূসকে শীর্ষে রেখেছেন। হিলারি ক্লিনটনের ব্যক্তিগত অনুরোধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রতিটি পশ্চিমা রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

চাপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ীকে কারাগারে পাঠানো ছাড়া সর্বপ্রকারে অব্যাহত হয়রানি করে চলেছে। হিলারি ক্লিনটনের কাছে প্রফেসর ইউনূসের চেয়ে বিএনপি অধিকতর প্রিয়, এমন অবাস্তব কল্পনা মূর্খদের পক্ষেই করা সম্ভব। সুতরাং, আন্দোলন শিকেয় তুলে রেখে মার্কিন চাপের সফলতার আশায় বিরোধী দল ঘরে বসে থাকলে তার পরিণতি আইন প্রতিমন্ত্রীর হুমকি মোতাবেক প্রকৃতই 'ভয়াবহ' হওয়া অসম্ভব নয়। মামলার ভয়ে আন্দোলনের মাঠ থেকে পলায়নের মেরুদণ্ডহীন কৌশল শেষ পর্যন্ত বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গ্রেফতারের কারণও হতে পারে। ভুলি কী করে, বর্তমান সরকারই ২০১০ সালে ঈদের মাত্র দু'দিন আগে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে গৃহহীন করেছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনার বক্তব্য উদ্ধৃত করে আজকের মন্তব্য প্রতিবেদন সমাপ্ত করব। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি নিয়ে আমার কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই, আমরা মনে করি, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই পথ খুঁজে বের করবে, যাতে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ তৈরি হয়, নাম যাই হোক না কেন। তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূর করতে হিলারি ক্লিনটনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের কোনোই সম্ভাবনা নেই। এ সমস্যা স্থানীয়, সমাধানও স্থানীয়ভাবেই করতে হবে। আপনাদের রাজনৈতিক সমস্যা আপনাদেরই মেটাতে হবে। বিদেশিদের পেছনে ছোটার প্রয়োজন নেই।" মার্কিন রাষ্ট্রদূত যথেষ্ট প্রাঞ্জলভাবে তার রাষ্ট্রের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। বিএনপি'র ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ প্রত্যাশীরা ড্যান মোজেনার বার্তাটি ধরতে পেরেছেন কীনা, সেটি অবশ্য আমার জানা নেই।

৩০ মে ২০১২

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খল পুলিশ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন দীর্ঘদিন মেঠো রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থেকে এবং একাধিকবার সংসদ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের একজন মাঠকর্মী হিসেবে প্রবীণ বয়সে এমপি হওয়াটাই তার জন্য পরম গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকায় তিনি প্রথম সুযোগেই কেবল ফুল মন্ত্রী নন, মহাশক্তিধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদও দখল করতে পেরেছেন। সুতরাং তিনি যে রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি-নৈতিকতা শিকেয় তুলে অতিমাত্রায় দল এবং দলীয় প্রধানের প্রতি অনুগত থাকবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

সাহারা খাতুন তার বিভিন্ন বক্তব্যে প্রসঙ্গ থাকুক আর না-ই থাকুক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেনে এনে তার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের বয়ান দেন, সেটার কারণও জনগণের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এতে আমজনতার হয়তো তেমন কোনো সমস্যাও হতো না। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হাতে পেয়ে তিনি প্রজাতন্ত্রের পুলিশ বাহিনীকে যে নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং দলীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করছেন, সেখানেই যত সমস্যা। গত সাড়ে তিন বছরে তার কণ্ঠে 'আমার পুলিশ' কথাটি যে কতবার উচ্চারিত হয়েছে, তার হিসাব রাখাই কঠিন।

পুলিশ যে প্রজাতন্ত্রের, সাহারা খাতুনের নয়–এটা বোঝানোর মতো কেউ সম্ভবত তার পাশে নেই। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান, তদীয় কন্যা শেখ হাসিনা এবং সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনীতিবিদ বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো করে রাষ্ট্রকে একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি বিবেচনা করেননি। একজন মন্ত্রী যখন তার মন্ত্রণালয়কে পৈতৃক অথবা দলীয়

জমিদারি ভাবতে শুরু করেন, তখনই সুশাসনের বারোটা বেজে যায়। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে আইন ও মানবাধিকারের প্রতি যে চূড়ান্ত অবজ্ঞা আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার প্রধান দায়-দায়িত্ব তাই বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই বহন করতে হবে।

সাহারা খাতুনের পুলিশ গত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে যে অমার্জনীয় কাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্তসার এবার প্রস্তুত করা যাক। গত মাসের ২৬

www.pathagar.com

তারিখে রোকেয়া সরণিতে পলিটেকনিকের ছাত্রীদের অবরোধের ছবি তোলার সময় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ প্রথম আলোর তিন ফটো সাংবাদিককে বেধড়ক লাঠিপেটা করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পেটানোর সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার চিৎকার করে বলেছে, পেটা সাংবাদিকদের, ওরাই যত নষ্টের গোড়া, এদেশে সাংবাদিক পেটালে কিছু হয় না। পুলিশ কর্মকর্তার দাবির পেছনে যুক্তি আছে। সত্যিই তো, ঘরে ঢুকে সাংবাদিক খুন করলে যে দেশে কিছু হয় না, সেখানে যৎসামান্য পিটুনি তো নস্যি! একই মাসের ২৯ তারিখে পুরনো ঢাকার আদালতপাড়ায় বাবা-মায়ের সঙ্গে আসা বিচারপ্রার্থী এক তরুণীকে পুলিশ ক্লাবে ধরে নিয়ে শ্লীলতাহানি করেছে আওয়ামী-বাকশালী পুলিশ। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্মমভাবে লাঠিপেটার শিকার হয়েছেন তিন সাংবাদিক, দুই আইনজীবীসহ অন্যান্য প্রতিবাদকারী জনতা। আহত তিন সাংবাদিক যথাক্রমে প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনে কর্মরত আছেন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার জন্য নির্যাতিত তরুণীকেই উল্টো কোতোয়ালি থানায় ধরে নিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল চক্রবর্তী খবর পেয়ে থানায় ছুটে না গেলে তরুণীটির কপালে আরও দুঃখ ছিল। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালকের সামনেই কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিনের উদ্ধত ব্যবহারের খানিকটা নমুনা আমরা টেলিভিশনে দেখতে পেয়েছি। কোতোয়ালি থানার এই ওসির সঙ্গে আমার রিমান্ড চলাকালীন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

'পবিত্র ভূমি' গোপালগঞ্জের অধিবাসী পুলিশ কর্মকর্তাটি আমাকে সারা রাত থানা গারদে জনা পনেরো মাদকাসক্ত ও দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেই অসহনীয় পরিবেশে সন্ধ্যা থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত অবস্থানকালে এক গ্লাস পানি পানেরও প্রবৃত্তি হয়নি। মিনিট তিরিশের কথাবার্তায় আমার কাছে ওসি সালাহউদ্দিনকে পুলিশের পোশাকে ছাত্রলীগের একজন পাণ্ডার মতোই লেগেছিল। সে বারবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলছিল, গোপালগঞ্জের অধিবাসী হওয়ার অপরাধে বিএনপি জমানায় তার ভালো কোনো জায়গায় পোস্টিং হয়নি। ভাবখানা ছিল আমিই যেন সেজন্য দায়ী।

ওসি সালাহউদ্দিন ছাড়াও ওই এলাকার বর্তমান ডিসি হারুন ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। ডিসি হারুন সংসদ এলাকায় বিরোধী দলের চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুককে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে

www.pathagar.com

দেশব্যাপী বিশেষ 'খ্যাতি' অর্জন করেছে। তার সেই 'বীরত্বপূর্ণ' কর্মকাণ্ডের পুরস্কার হিসেবেই সাহারা খাতুন হারুন-উর রশীদকে তেজগাঁও জোনের এডিসি থেকে পদোন্নতি দিয়ে লালবাগ জোনের ডিসি বানিয়েছেন। হারুন-উর রশীদ এর আগে লালবাগ জোনে এসির দায়িত্বও পালন করেছেন। ২০১০ সালে লালবাগ জোনে দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ বিভাগীয় তদন্তে প্রমাণ হয়েছিল। ছাত্রলীগ সংযোগের জোরে সে যাত্রায় তার চাকরি রক্ষা পায়। এহেন হারুন-সালাহউদ্দিনের যৌথ তাণ্ডবে লালবাগ-কোতোয়ালি এলাকার জনগণের কী হাল হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

যা-ই হোক, অনেক টালবাহানা শেষে ৩০ তারিখ রাত দুটায় নির্যাতিত তরুণীর মামলা কোতোয়ালি থানা গ্রহণ করেছে। গত মাসের ৩০ তারিখে গাজীপুরের পুলিশ মামুন ভূঁইয়া নামে একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে হাতকড়া পরিয়ে খুনিদের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে অসহায় মামুনকে হত্যা করে। হত্যা নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ নিহতের হাতকড়া খুলে অকুস্থলে ফেলে রাখে। পুলিশ হেফাজতে আসামি খুনের এ এক লোমহর্ষক কলঙ্কজনক ঘটনা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত একই সপ্তাহের অন্যান্য খবর পর্যালোচনা করলে থানা হেফাজতে অভিযুক্তদের পুলিশি নির্যাতনের আরও অনেক নৃশংস ঘটনা চোখে পড়বে।

নজিরবিহীন পুলিশি নির্যাতন এবং আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি সত্ত্বেও সাহারা খাতুন অব্যাহতভাবে দাবি করে চলেছেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাকি দশ বছরের মধ্যে সর্বোত্তম অবস্থায় রয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে তিনি আরও দাবি করছেন, পুলিশও নাকি আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। এই দাবির পেছনে তার যুক্তি হলো, বিরোধী দলে থাকাকালীন রাস্তায় আন্দোলনের সময় পুলিশ পিটিয়ে তার একটি পা ভেঙে দিয়েছিল। এখন সেই পুলিশ জাতীয় সংসদের সামনে বিরোধী দলের চিফ হুইপের পা এবং মাথা ভেঙে দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য সেটাকে যথেষ্ট বিবেচনা করছেন না।

বরং যে পুলিশ কর্মকর্তা এই গর্হিত কাজটি দিনদুপুরে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে করেছিল, তাকে পদোন্নতি দিয়েছেন দিনবদলের সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। তিনি যেদিন তার প্রিয় পুলিশের সাফাই গাইছিলেন, তার আগের দিনেই আদালত চত্বরে এক বিচারপ্রার্থী তরুণী পুলিশের শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আরও অর্ধডজন নারী বর্তমান মন্ত্রিসভার শোভাবর্ধন করলেও তাদের কাছ থেকে ধর্ষকামী পুলিশের ন্যক্কারজনক আচরণের কোনো নিন্দা এ যাবত জাতির শোনার সৌভাগ্য হয়নি।

www.pathagar.com

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সঙ্গে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও দুটি তাকলাগানো মন্তব্য করেছেন। সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের সাড়ে তিন মাস পর তিনি দাবি করছেন, সাংবাদিক দম্পতি হত্যাকারীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের কথা তিনি বলেননি। তিনি শুধু পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যুক্তি শুনে সেই 'তৈলাধার পাত্র নাকি পাত্রাধার তৈল' বিতর্কের কথা মনে পড়ে গেল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের নির্দেশ প্রতিপালিত না হওয়ার অপরাধে পুলিশের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, সে বিষয়ে অবশ্য সাহারা খাতুন মুখ খোলেননি। একই অনুষ্ঠানে চমৎকৃত হওয়ার মতো তার দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুও সাংবাদিকদের পুলিশের কাছ থেকে দূরে থাকার কথা বলেননি। মিডিয়াই নাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই মহা শক্তিধরের কথা বিকৃত করে ছেপেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের পর্বতসম ব্যর্থতা ঢাকতে মিডিয়াকে দোষারোপ করা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীদের রীতিমত মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আওয়ামী-বিএনপি-সুশীল-বাম– সবপন্থী পত্রিকাতেই সাহারা খাতুন এবং শামসুল হক টুকুর বক্তব্য অভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি সত্য হলে মেনে নিতে হবে বাংলাদেশের তাবৎ গণমাধ্যম একসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পেছনে লেগেছে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুযায়ী উভয়েরই এবার পদত্যাগ অথবা পদচ্যুতির সময় এসেছে। পদত্যাগের সংস্কৃতি আমাদের দেশে তেমন একটা নেই। বিশেষ করে, কালো বিড়ালখ্যাত সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও তিনি উজিরে খামাখার চেয়ারে বসে কিছুকাল নিশ্চুপ থেকে এখন আবার যেভাবে প্রায় প্রতিদিন টেলিভিশনে এসে জাতিকে জ্ঞান দিচ্ছেন, তাতে ভবিষ্যতে জনগণ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় না করা পর্যন্ত মহাজোটের কেউ আর মন্ত্রিত্বের চেয়ার ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে না। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষেও যেহেতু বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যদের মতো এতগুলো মেরুদণ্ডহীন চাটুকার একসঙ্গে খুঁজে পাওয়া আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যেও কঠিন হবে, কাজেই পদচ্যুতিরও প্রশ্ন ওঠে না। অতএব পুলিশ আগের চেয়ে অনেক ভালো–স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সার্টিফিকেটের পর বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যে অপেক্ষমাণ, সে আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে অন্য ধরনের একটি তথ্য দিয়ে আজকের মতো মন্তব্য প্রতিবেদন শেষ করব। বাংলাদেশ পুলিশের PRP (Police Reform Programme) নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি

www.pathagar.com

(UNDP) এবং ডিএফআইডি (DFID)'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউএনডিপি প্রণীত প্রকল্পটির একটি সারসংক্ষেপ (Summary) পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই নথিতে Outcome এবং Output নামে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। Outcome-এ বলা হয়েছে, "The human rights of children, women and vulnerable groups are progressively fulfilled within the foundations of strengthened democratic governance." অর্থাৎ শিশু, নারী এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানবাধিকার ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত হবে, যার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তিও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর Output অংশে বলা হয়েছে, "Strengthened capacity of the justice system to ensure democratic governance, protect human rights and human security, improve participation in governance, and access to public services among poor communities." অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার রক্ষা এবং নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহজ প্রবেশাধিকার। পিআরপি প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিমাণও বিশাল। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল, এই পাঁচ বছরে ২৯.০১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (২৪৫ কোটি টাকা) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইউএনডিপি ৮ মিলিয়ন ডলার এবং ডিএফআইডি ১৬.৩ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করবে।

প্রকৃতপক্ষে, পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায় (PRP-Phase I) শুরু হয় ২০০৫ সালে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের (PRP-Phase II) বাস্তবায়ন চলছে। প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সেটি পরিশোধের দায় বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের। কাজেই জনগণের অর্থ ব্যয় করে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর যদি পুলিশ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর বর্বর আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে, তাহলে রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিকই এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এ-জাতীয় প্রশিক্ষণে যে আসলে কোনো কাজ হয় না, সেটা আমরা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও দেখেছি। বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকল্প নিয়ে বিচারপতিদের বিদেশ যাত্রার সুযোগ বেড়েছে বটে; কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের আদালতগুলোতে সাধারণ নাগরিকের বিচার পাওয়ার সুযোগও ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রণীত পিআরপি-তেও Justice system-এর দক্ষতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো,

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক সময়ে নিম্ন ও উচ্চ উভয় আদালতেই দলীয়করণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বিচারপতিগণ আগের মতো সাহসিকতার সঙ্গে ন্যায়বিচার করতে পারছেন না। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে কোনো রাখঢাক না রেখেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের রাজনীতি কলুষিত, আদালতে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচার পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আদালত ও পুলিশ উভয়ই তীব্র বেগে রসাতলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং বৈদেশিক অর্থায়নে গৃহীত এ-জাতীয় যাবতীয় প্রকল্পের মূল্যায়ন জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

শেখ হাসিনার সরকার মূলত পুলিশ এবং আদালতের ওপর ভর করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। ১৯৯৬ সালে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোট দেয়ার সেই অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে মহাজোট সরকার। এরশাদ পতনের পর দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে।

একটি নির্যাতক পুলিশি রাষ্ট্র তৈরির মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা তাদের মসনদে টিকে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। আড়িয়ল বিল এবং বিল কপালিয়ার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ দেখেও তাদের সংবিৎ ফিরছে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনো দেশেই নির্যাতনকারীরা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। তাদের দুঃখজনক পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ক'দিন আগে গণহত্যার অভিযোগে মিসরের এক সময়ের লৌহমানব হোসনি মোবারকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটখাটো লৌহমানবীরা সেখান থেকে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

বি. দ্র. : গত সপ্তাহে ওসির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে এই সোমবার মামলা দায়ের করেছেন নিম্ন আদালতের একজন আইনজীবী। বিতর্কিত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মারপিট, জখম ও হত্যার হুমকির অভিযোগ আনা হয়েছে।

৬ জুন ২০১২

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন ০৫
www.pathagar.com

আগ্রাসী দলীয়করণের অশুভ পরিণতি

দিন বদলের সরকার তাদের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সঙ্গে বিতর্কিত করতে সক্ষম হয়েছে। দলবাজ প্রশাসন নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে, গত সপ্তাহে পুলিশের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে আমি নিজেও লিখেছি। আজ বিচার বিভাগ এবং সংসদের মধ্যকার সাম্প্রতিক বহুল আলোচিত বাদানুবাদের মধ্যেই আমার মন্তব্য-প্রতিবেদন সীমিত রাখব। এই আমলের বিচার বিভাগের সঙ্গে আমার বৈরী সম্পর্কের কথা শুধু দেশবাসী নয়, বিদেশের অধিকাংশ মানবাধিকার সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরাও অবগত আছেন।

আদালতে সরকারি দলের নজিরবিহীন দলীয়করণের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ এবং মন্তব্য-প্রতিবেদন লেখার 'অপরাধে' আমি আদালত অবমাননার দু'টি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন জেলও খেটে এসেছি। সরকার ও বিচার বিভাগের হাতে নানাভাবে অত্যাচারিত হলেও আমার জন্য সন্তোষের বিষয় হলো, যে কথাগুলো আমি আড়াই বছর আগে লিখেছিলাম, সেগুলোই আজ দেশে-বিদেশে সবাই বলছেন। আদালত শুদ্ধিকরণের লড়াইয়ে তখন একাকী হলেও আজ মনে হচ্ছে, আমি আর নিঃসঙ্গ নই। কোটারি সর্বস্ব বাংলাদেশে আমরা যার যার সুবিধামত ইতিহাস তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। সুবিধাবাদীদের ইতিহাস তৈরি প্রসঙ্গে এক-এগারোর সরকারের সময়কালীন একটা উদাহরণ দিয়ে আজকের মূল বিষয়ে ফিরব।

এক-এগারো সরকারের একেবারে প্রথমদিকের সমালোচনাকারীদের মধ্যে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যু দেতার প্রথম দিনে ওই সরকারের গঠন প্রণালী এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ। বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রথম যে বিবৃতিটি ছাপা হয়েছিল, সেটিরও এক নম্বর স্বাক্ষরদাতা ছিলেন সবার শ্রদ্ধাভাজন সামাদ ভাই। সেই সময় নয়া দিগন্ত পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে জেনারেল মইন ও ফখরুদ্দীনের যৌথ সরকারের মুখোশ উন্মোচনের যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়েছিলাম আমি এবং কবি, প্রাবন্ধিক ফরহাদ মজহার। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের

www.pathagar.com

ঔরসে জন্মলাভকারী সরকারটি ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর আমি সেই সরকারের সমালোচনা করে প্রথম কলামটি লিখেছিলাম একই মাসের ২৭ জানুয়ারি। 'অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার বিপদ সংকেত' শিরোনামে লেখা কলামের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি;

"তবে দেশের ভালো চাইলে, অর্থনীতির উন্নয়ন চাইলে, যত তাড়াতাড়ি জনগণের নির্বাচিত একটি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়, ততই মঙ্গল। স্বদেশের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের চেয়ে উত্তম এবং বৈধ কোনো সরকারব্যবস্থা এ যাবত আবিষ্কার হয়নি। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে কোনো ষড়যন্ত্র ছাড়াই আমরা দ্রুততার সঙ্গে সর্বনাশের দিকে ধাবিত হবো। আশির দশকের এক পতিত, দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরশাসককে সব দল মিলে মহা তারকারূপে পুনর্বাসিত করে সেই অগস্ত্যযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটা আমরা বোধহয় নিয়েই ফেলেছি।"

গণতন্ত্রের সপক্ষে আমার কলম ধরার মুহূর্তে ডাকসাইটে রাজনীতিবিদরা হয় গা-ঢাকা দিয়েছেন, নয়তো বোবার শত্রু নাই নীতি গ্রহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টায় রত ছিলেন। সেই কঠিন সময়ে দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীকুল এবং সুশীল (?) সমাজের প্রতিনিধিরা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থেকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নয়া দিগন্তে প্রকাশিত ওই একই কলামে এক-এগারোর সরকার যে আইনসিদ্ধ নয়, সেই ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলাম–'বাস্তবতা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আইনসিদ্ধ হয়েছে কী না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এ নিশ্চয়তা বোধহয় কেউ দিতে চাইবেন না যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন প্রক্রিয়া, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল প্রজ্ঞাপন এবং সেই বাতিল করা নির্বাচনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ১৭ জন সংসদ সদস্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করার অভিযোগ ভবিষ্যতে উত্থাপিত হবে না।'

উল্লিখিত কলামটি কাশবন প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত আমার প্রথম বই 'জাতির পিতা ও অন্যান্য' বইয়ে সঙ্কলিত হয়েছে। লেখালেখির বাইরে টেলিভিশন টকশো'তে দেশবাসীকে বিশেষ সরকারের স্বরূপ চেনানোর বিপজ্জনক দায়িত্ব নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবির এবং সাবেক সচিব মো. আসাফউদ্দৌলাহ সাহসিকতার সঙ্গে পালন করেছেন। আমিও দুই-একটি চ্যানেল থেকে কখনও সখনও ডাক পেলে ছদ্মবেশী সামরিক সরকারের কঠোর সমালোচনা করতাম। টেলিভিশনে আমার কালো তালিকাভুক্তির সূচনাও তখনই ঘটে। আর এই

www.pathagar.com

আমলে তো কোনো চ্যানেলে আমাকে আমন্ত্রণ জানালে সেই চ্যানেল বন্ধের সরাসরি হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে। আজকাল টক শো'তে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক-এগারো সরকারের বিরোধিতা করার অসত্য দাবি করে থাকেন, তাদের অধিকাংশই তখন হয় নীরব থেকেছেন অথবা সামরিক সরকারের পক্ষাবলম্বন করেছেন। ইতিহাস বিকৃতি সম্ভবত আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। একইভাবে বিচার বিভাগ আজ চারদিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনেক ব্যক্তিই হয়তো দাবি করবেন যে, তারাই মামলার ঝুঁকি নিয়েও আদালত পাড়ার অনিয়মের প্রতিবাদ করেছেন। হাওয়া বুঝে পাল খাটানোতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তির অভাব এ দেশে কোনোদিনই হয়নি। তবে এক্ষেত্রে জেল খাটা আসামি হওয়ার কারণে আমার অন্তত খানিকটা অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। ধারণা করছি, আমার দু'টি আদালত অবমাননা মামলার সব নথিপত্র এবং রায় ডিএলআর (DLR)-এ স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং, ইচ্ছে থাকলেও অন্য কারও পক্ষে সেই ইতিহাসে ভাগ বসানো সম্ভব হবে না।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। বর্তমান সরকার তাদের সাড়ে তিন বছরে উচ্চ আদালতে রেকর্ড সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছে। সেসব নিয়োগের পেছনেও মূলত দলীয় বিবেচনাই কাজ করেছে। এই বিচারপতিদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির আত্মীয় হিসেবে পরিচিত বিশেষ একজনকে নরসিংদীর জেলা জজ থেকে কয়েক ডজন সিনিয়রকে ডিঙিয়ে ঢাকার জেলা জজে পদোন্নতি দিয়ে পরে হাইকোর্টের বিচারপতি পর্যন্ত করা হয়েছে। এছাড়া খুনের মামলার আসামি এবং সুপ্রিমকোর্টে ভাংচুরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীও বিচারপতি হয়েছেন। বাদবাকি নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অতীতে সরকারদলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনার কোনোরকম তোয়াক্কা বর্তমান সরকার করেনি।

গত সাড়ে তিন বছরে আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগেও নির্বিচারে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। আদালতকে অপব্যবহার করে ভিন্নমত দলনের এক চরম নিন্দনীয় নজির স্থাপন করেছে দিন বদলের সরকার। হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন নিয়েও আদালত পাড়ায় নানারকম বিতর্ক রয়েছে। সিনিয়র বিচারপতিদের সমন্বয়ে রিট বেঞ্চ গঠন না করে দলীয় বিবেচনায় সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এক সময় উচ্চ আদালতে অধিক সংখ্যায় বিব্রত হওয়ার নজিরের সঙ্গে হাল আমলে বিভক্ত রায়ের রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের ইচ্ছায় নিম্ন আদালতে রিমান্ড আবেদন মঞ্জুরের রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে। পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করে

www.pathagar.com

সুপ্রিমকোর্টের একজন আইনজীবীকে পর্যন্ত হত্যা করার ন্যক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে মহাজোট সরকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই মর্মন্তুদ ঘটনার জন্য আজ পর্যন্ত একজন বিচারপতিকেও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। বরঞ্চ সাম্প্রতিক সময়ের সর্বাধিক বিতর্কিত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী লন্ডনে টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে পুলিশের এত বড় নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। একই বিচারপতি মো. আসাফউদ্দৌলাহ, সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং শফিক রেহমানসহ দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের তার এজলাসে ডেকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছেন। উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য প্রণীত আচরণবিধিও তিনি প্রতি পদে লঙ্ঘন করেছেন। প্রধান বিচারপতি এই অসঙ্গত আচরণের রাশ টেনে ধরার কোনোরকম চেষ্টা করেননি। অবশেষে সংসদের সঙ্গে আদালতের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ সৃষ্টিতেও একই বিচারপতি মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন।

সরকারের অতিমাত্রায় দলীয়করণের নীতি এবং আদালত নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি অবধারিত ছিল। এই আশঙ্কা থেকেই ২০১০ সালের ১০ মে 'স্বাধীন বিচারের নামে তামাশা' শীর্ষক প্রতিবেদনে লিখেছিলাম–

"একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে মাননীয় বিচারকদের সঙ্কীর্ণ দলীয় চিন্তাধারা অতিক্রম করে কেবল সংবিধান ও দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিচার বিভাগকে দলীয়করণের যে মন্দ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, সেখান থেকে তারা নিবৃত্ত না হলে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমেই অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের দেশের দুর্গতির জন্য এক সময় ব্যবসায়ীদের দায়ী করা হতো। তারপর আমলা এবং রাজনীতিকদের। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শেষ ভরসার স্থল বিচার বিভাগ এবার কলঙ্কিত হয়েছে। বিচারপতি নিয়োগ থেকে শুরু করে বিচারকদের আচার-আচরণ, সর্বত্র অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন দৃশ্যমান। এই অনাচারের পরিণামে জাতি হিসেবে সম্মিলিতভাবে শেষ পর্যন্ত হয়তো চরম মূল্যই আমাদের দিতে হবে। বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানে অন্যায়-অবিচারের ভয়াবহ বিস্তৃতি এক সময় দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব নাগরিককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে যখন ক্যালদীয়রা পবিত্র নগরী জেরুজালেম আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছিল, সেই সময়ের নবী যেরেমিয়া আক্ষেপ করে বলেছিলেন, জাতির সঞ্চিত পাপ সমস্ত জাতিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় (অভিশপ্ত নগরী, সত্যেন সেন)।"

www.pathagar.com

এই লেখালিখিতে সংশ্লিষ্টদের সংবিৎ ফেরার পরিবর্তে আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আমাকে সাজা দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করে সুপ্রিমকোর্ট ভবিষ্যতের সব সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ৫ জুন তারিখে জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের তার বিরুদ্ধে দল বেঁধে সমালোচনা আমার উপরিউক্ত লেখার যৌক্তিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নতুন করে প্রমাণ করেছে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোধ করছি।

দেশের শীর্ষ আইনজীবীরাও সংসদ এবং আদালতের মুখোমুখি অবস্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা যথার্থই বলেছেন, রাষ্ট্রের এই দুই স্তম্ভের মধ্যকার তিক্ততা অব্যাহত থাকলে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই হুমকির মুখে পড়বে। তারা দুই পক্ষের মন্তব্যকেই অনভিপ্রেত উল্লেখ করে ব্যাপারটির আশু সমাধান কামনা করেছেন। আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মধ্য দিয়েই সংসদের ওপর আদালতের এক ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর সপ্তম এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীর ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছে। দেশের খ্যাতিমান আইনজীবীদের মধ্যে অন্যতম ড. কামাল হোসেন অবশ্য বলেছেন, দেশের তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় সংসদই সুপিরিয়র। যে ব্রিটিশ সিস্টেমের আদলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেখানেও সংসদের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সে কারণে যুক্তরাজ্যে সব বিষয়কে আদালতে টেনে নেয়ার রেওয়াজ নেই। আদালতও Justiciability (আদালতের এখতিয়ার)-এর আলোকে সিদ্ধান্ত নেন কোন বিষয়টি তাদের বিচারিক আওতার মধ্যে পড়ে। সাধারণত সংসদ দ্বারা প্রণীত আইন বিষয়ে তারা বিচার করতে অপারগতা প্রকাশ করে থাকেন। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম মানবাধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা।

১৯৯৮ সালে ব্রিটেনে Human Rights Act প্রণীত হওয়ার পর থেকে আদালত কোনো আইন পর্যালোচনা করে যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ওই আইনের কোনো অংশ Human Rights Act, ১৯৯৮-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাহলেই কেবল ওই অংশ সংশোধনের জন্য আইনটি সংসদে ফেরত পাঠানো হয়। এর বাইরে অবশ্য Judicial review (বিচারিক পর্যালোচনা) করার রেওয়াজ রয়েছে। আইন নিয়ে পড়াশোনা না করলেও আইন সংক্রান্ত কিছু বই-পত্র উল্টে-পাল্টে দেখার সুযোগ হয়েছে। সংসদে গৃহীত পঞ্চম, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী আদালত কর্তৃক যেভাবে বাংলাদেশে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, আমার ধারণা, তার তুল্য নজির যুক্তরাজ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংসদে প্রণীত আইনের

www.pathagar.com

উচ্চতর অবস্থান সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের স্বনামধন্য বিচারপতি লর্ড রিড (Lord Reid) তার এক রায়ে বলেছেন :

"In earlier times many learned lawyers seem to have believed that an Act of Parliament could be disregarded in so far as it was contrary to the law of God or law of nature or natural justice, but since the supremacy of Parliament was finally demonstrated by the revolution of 1688 any such idea has become obsolete."

(অতীতে অনেক আইনজীবীর মধ্যে এমন ধারণা ছিল যে, সংসদে প্রণীত আইন উপেক্ষণীয় হতে পারে যদি সেটি স্রষ্টার আইন কিংবা প্রকৃতির আইন অথবা স্বাভাবিক আইনের পরিপন্থী হয়; কিন্তু ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে সংসদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে এ জাতীয় ধারণা সেকেলে হয়ে গেছে।)

বাংলাদেশে এর আগে কখনও বিচার বিভাগ এবং সংসদের মধ্যে এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়নি। আগের বিচারপতিরা সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে আচরণবিধি সুচারুরূপে পালন করার কারণে সমাজের সব অংশের কাছে সমভাবে শ্রদ্ধাভাজন থাকতেন। মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে কথায় কথায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় আদালতে টেনে নেয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থার এতটাই অবনতি হয়েছে যে, এক বাদী পবিত্র কোরআন শরীফ পর্যন্ত সংশোধনের আবদার নিয়ে রিট বেঞ্চে হাজির হওয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই অধঃপতনের দায়-দায়িত্ব বর্তমান সরকারকেই সর্বতোভাবে বহন করতে হবে।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রাথমিক কাজটি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন (Impeach) করার ক্ষমতা সংসদের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। সংবিধানের বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী অভিশংসনের জন্য একমাত্র রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে Supreme Judicial Council গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন। সংবিধানের ৯৬ (৩) ধারায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়া নিম্নোক্তভাবে নির্দেশিত হয়েছে :

'একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে কাউন্সিল বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুই জন কর্মে প্রবীণ তাহাদের লইয়া গঠিত হইবে।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই বিচার বিভাগই মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদান খাটো করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়ে রায় দিয়ে দেশে অনভিপ্রেত

www.pathagar.com

বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ১৯৭১ সালে প্রকৃতপক্ষে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান আদৌ আদালতের এখতিয়ারের (Justiciable) মধ্যে পড়ে কীনা, এই প্রশ্ন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যেই রয়েছে। ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তন হলে জনগণ অবশ্যই সে প্রশ্নের জবাব খুঁজবে। ইতিহাস রচনার দায়িত্ব যে ইতিহাসবিদদের কাছেই থাকা উচিত, আমার এই মন্তব্যের সঙ্গে আশা করি দেশের অধিকাংশ নাগরিকই সহমত পোষণ করবেন।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীকে উপলক্ষ করে সংসদ ও বিচার বিভাগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা আবারও সংসদে ফিরিয়ে আনার হুমকি দিয়েছেন। তবে হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত'র আছে কিনা, সেটি ভিন্ন প্রশ্ন। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর ক্ষমতাকেও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তার সঙ্গে ঢাকায় ও লন্ডনে অবস্থানকারী বাংলাদেশের তথাকথিত রাজ পরিবারের সদস্যদের গভীর সম্পর্কের বিষয়টি আদালত পাড়ায় বহুল প্রচারিত। সুতরাং, পুরো বিতর্কটি ধামাচাপা পড়লে আমাদের অবাক হওয়া উচিত হবে না।

এদিকে বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এবং প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে ফিরিয়ে আনার পক্ষেই মত দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের আদি সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতিদের অভিশংসনের (Impeachment)-এর ক্ষমতা সংসদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করলেও সেই সংশোধনীর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের ধারাটি পূর্ববৎ রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ রায় লেখার সময় তিনি বিচার বিভাগের কোটারি সুবিধার বিষয়টি মাথায় রেখেছিলেন। বিচারপতিদের অভিশংসনের বিষয়ে যেহেতু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সংসদ সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, কাজেই ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যে আবারও সংবিধান সংশোধনের দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে।

৪১ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে শাসকশ্রেণী জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনোরকম তোয়াক্কা না করে সংবিধানকে কেবল নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসেবে যার যার সুবিধামত ব্যবহার করেছে। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রধানমন্ত্রিত্বের সাড়ে তিন বছরে এই গর্হিত কাজটি এতটাই নগ্নভাবে করা হয়েছে যে, জনগণের মধ্যে সংবিধান সম্পর্কেই এক ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সংবিধানে বারবার কাটাছেঁড়ার পরিবর্তে এবার

www.pathagar.com

দ্বিতীয় রিপাবলিক গঠনের মাধ্যমে নতুন করে সংবিধান প্রণয়নই সম্ভবত ষোল কোটি মানুষের মুক্তির পথ হতে পারে। ১৯৭২ সালে যে সংসদ সংবিধান প্রণয়ন করেছিল, সেই সংসদের সব সদস্য ১৯৭০ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসনাধীন লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (Legal Frame work)-এর অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় (MNA) ও প্রাদেশিক (MPA) সংসদের সব সদস্যকে একত্রিত করে বাংলাদেশের গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিল। নির্বাচিতদের মধ্যে পাকিস্তানের কয়েকজন দালালকে কেবল গণপরিষদের বাইরে রাখা হয়েছিল। এ সবই ইতিহাসের অংশ। কাজেই চার দশকের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের গণআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এবার দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ পাওয়া উচিত। নতুন সংবিধান প্রণয়নে সমাজের সব শ্রেণীর জনগণ অংশগ্রহণ করলে সেই দলিলে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা করা যায়। এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিবিদসহ দেশের সব বিজ্ঞজন ভেবে দেখতে পারেন।

১০ জুন ২০১২

www.pathagar.com

স্বজন গুম হলে প্রতিবাদ করা যাবে না

ক'দিন আগে একুশে রাত অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী মো. ইউসুফ হোসেন হুমায়ূনের বক্তব্য শুনছিলাম। তার বিপরীতে ছিলেন বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, সদ্য কারামুক্ত ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। সেই অনুষ্ঠানে ইলিয়াস আলী গুম প্রসঙ্গে ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বললেন, পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আন্দোলন করে ইলিয়াসের নাকি ক্ষতি করা হয়েছে। তার মতে, গুম নিয়ে দেশে-বিদেশে অতিরিক্ত হৈ চৈ হওয়ায় অপহরণকারীরা ইলিয়াস আলীকে আর ছেড়ে দিতে পারেনি। অর্থাৎ গুমের পর চুপচাপ থাকলে সরকার তাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিত!

ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন সরকারি দলে আছেন। সুতরাং ধারণা করছি, ইলিয়াস আলীর ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা তিনি জেনেশুনেই এই মন্তব্য করেছেন। সেদিন তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, তিনি গুমকারীদের পক্ষে ওকালতি করছেন। তার পরামর্শ মোতাবেক এখন থেকে এদেশে অপহরণকারীরা কাউকে ধরে নিয়ে মুক্তিপণ দাবি করলে সাহারা খাতুনের পুলিশকে না জানিয়ে চুপচাপ মুক্তিপণ দেয়াটাই সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে কী চমৎকার আইনের শাসন চলছে! কোনো বেয়াড়া নাগরিক যদি প্রশ্ন করেন–তাহলে আর জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় পুলিশ পুষে লাভটা কী, ইউসুফ হোসেন হুমায়ূনদের সেই প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনো ঠেকা নেই।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একতরফা জয়লাভের ফলে আমরা সবাই আজ তাদের প্রজায় পরিণত হয়েছি। আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী যে ভিন্নমতাবলম্বীদের ধরে নিয়ে গুমরাজ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে না, এতেই আমজনতার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তবে এ প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম এবং বিএনপির ঢাকা মহানগরের নেতা চৌধুরী আলমের কথা তুললে ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন কী জবাব দেবেন, সেটা জানার সুযোগ আমাদের এখনও হয়নি। কারণ ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কিংবা কোনো দর্শক প্রশ্নটি সেদিন উত্থাপন করেননি। শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামকে গুম করে হত্যা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তিনি গুম হওয়ার পর আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত অজ্ঞাত লাশের ছবি দেখেই তার পরিবার তাকে চিনতে পেরেছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরকালে আমিনুল ইসলামের গুম ও হত্যা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। ঢাকা শহরের নির্বাচিত একজন কমিশনার চৌধুরী আলম ২০১০ সালের জুন মাসে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গুম হওয়ার পর থেকে আর ফিরে আসেননি। আমি তখন কারাগারে ছিলাম। কাজেই চৌধুরী আলমের গুম নিয়ে বিএনপি কতটা তীব্র আন্দোলন করেছিল, সেটা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তবে জেল মুক্তির পরে শুনেছি দলটি তেমন কিছুই নাকি করেনি। এমনকি ঢাকা মহানগরীতেও একটি দিনের জন্যও হরতাল আহ্বান করা হয়নি। বিদেশেও যে তেমন উচ্চবাচ্য হয়েছে, সেরকম কোনো প্রমাণ আমার হাতে অন্তত আসেনি। তাহলে ইউসুফ হোসেন হুমায়ূনের দলের অপহরণকারীরা চৌধুরী আলমকে অদ্যাবধি কেন ছেড়ে দিল না কিংবা আমিনুল ইসলামকে কেন হত্যা করল, সেই প্রশ্ন করার সুযোগ হলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যকে অবশ্যই করব।

বিএনপির তরুণ প্রজন্মের নেতা ইলিয়াস আলীর একমাত্র মেয়ে নাওয়ালের দশম জন্মদিন ছিল এ মাসের ১৮ তারিখে। তার আগের দিন ইলিয়াসের গুমের দুই মাস পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে স্বাধীনতা ফোরাম নামীয় একটি সংগঠন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীক অনশনের আয়োজন করেছিল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সংগঠনটির সভাপতি আবু নাসের রহমতউল্লাহ্ অনশনস্থলে গণআদালতের কিছু প্রতীক যেমন দাঁড়ি-পাল্লা, কাঠগড়া ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তাদের মূল সুর ছিল এদেশে ভবিষ্যতে কোনোদিন প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ইলিয়াস আলী গুমের হোতাদের অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। সংসদে বিরোধী দলের চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছিলেন, বর্তমান সরকারের কাছে ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানানোটাই কালক্ষেপণ মাত্র।

বাংলাদেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থায় ভিন্নমতের রাজনীতিবিদদের ইনসাফ পাওয়ার যে কোনো সুযোগ নেই, সেটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনেও প্রকাশিত হয়েছে। এদেশে এমন বিচিত্র অবস্থায় আমরা বসবাস করছি যে, আদালতে ন্যায়বিচার না পেলে সে কথাটি প্রকাশ্যে বলারও স্বাধীনতা নেই। কারণ মাননীয় বিচারপতিগণ আদালত অবমাননা নামক মহা শক্তিশালী অস্ত্র হাতে নিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্রে আদালত অবমাননা আইনের এমন যথেচ্ছ

www.pathagar.com

ব্যবহারের নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদেশে চিন্তা, বিবেক, বাক ও লেখার স্বাধীনতা আজ কাগুজে বুলিতে পরিণত হয়েছে।

এ মাসেরই ২১ তারিখ সন্ধ্যায় সাদা পোশাকে দু'জন ব্যক্তি পান্থপথে বসুন্ধরা মার্কেট থেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিত টুপি-দাড়িওয়ালা একজনকে অপহরণের চেষ্টা করে। অসহায় ব্যক্তিটি চিৎকার করে তাকে বাঁচানোর আবেদন করলে মার্কেটের লোকজন ছুটে আসে এবং অপহরণকারীদের পরিচয় জানতে চায়। তারা নিজেদের র‍্যাব-২-এর সদস্য পরিচয় দিয়ে জানায়, টুপি-দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের হাতের ব্যাগ দেখে তাদের নাকি সন্দেহ হয়েছে যে সেখানে ফেনসিডিল রয়েছে। ব্যাগ খুলে সেখানে কাগজপত্র এবং ভদ্রলোকের ১৫ হাজার টাকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। উপস্থিত জনগণ তখন অসহায় লোকটিকে ছাড়িয়ে দেয়। এতে র‍্যাব পরিচয় দানকারী দুই ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, এখানের সবাইকে আটক করতে হবে, গাড়ি খবর দাও। জড়ো হওয়া লোকজন স্বাভাবিকভাবেই সেখান থেকে সরে যেতে থাকেন। এই সুযোগে সাদা পোশাকের দুই অপহরণকারীও সটকে পড়ে। পুরো ঘটনাটি আমার দেশ পত্রিকায় পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্ধৃত ঘটনাটি বিচ্ছিন্নভাবে দেখার উপায় নেই। বাংলাদেশে যতগুলো গুমের ঘটনা ঘটেছে, তার প্রত্যেকটিতে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, সাদা পোশাকধারীরাই নিখোঁজ ব্যক্তিদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। চৌধুরী আলম এবং ইলিয়াস আলীর গুমেও একই ধরনের বর্ণনা পাওয়া গেছে। উভয় ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তিরা তাদের গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে সাদা মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। চৌধুরী আলমের গাড়িচালক জীবিত ফিরে এসে ঘটনার বর্ণনা দিতে পারলেও ইলিয়াস আলীর সঙ্গে তার গাড়িচালকও গুম হয়েছে। সাদা পোশাক এবং সাদা গাড়ির অপহরণকারীরা দেশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রত্যেক নাগরিকের সাদা পোশাকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা উচিত। দাবি জানানো উচিত সাদা পোশাকের কোনো পুলিশ দেশের কোনো নাগরিককে গ্রেফতার করতে পারবে না।

ইলিয়াসের মেয়ে নাওয়াল এবার তার জন্মদিন পালন করেনি। তবে জন্মদিন উপলক্ষে সে প্রধানমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি লিখেছে। সেই চিঠিতে বাবাকে জন্মদিনের উপহার রূপে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আকুতি জানিয়েছে। পিতৃহারা এই ছোট্ট বালিকার আকুতিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মন গলার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ষাটোর্ধ্ব প্রধানমন্ত্রী ৩৭ বছর আগে নিহত তার বাবা-মা-ভাইয়ের জন্য আজও প্রকাশ্যে নিয়মিত অশ্রুপাত করলেও

www.pathagar.com

অন্যের বেদনা তাকে কোনোরকম স্পর্শ করে, এমন কোনো প্রমাণ দেশবাসী এখনও পায়নি। বিশেষত ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি তিনি যে ভয়ানক বিতৃষ্ণাবোধ করেন, সেটি তার আচার-আচরণ এবং বক্তব্যে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, তার কাছ থেকে নাওয়ালের চিঠির কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা আশা করতে পারি না। ইলিয়াস গুম হওয়ার কয়েকদিন পরই নাওয়াল একই আকুতি নিয়ে তার মাকে সঙ্গে করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল। সেদিন শেখ হাসিনা ইলিয়াসকে ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস প্রদান করলেও আজ পর্যন্ত তার বাস্ত বায়ন হয়নি। উল্টো পুলিশ এখন ইলিয়াসের পরিবারকে নানা উপায়ে হয়রানি করছে। মধ্যরাতে তার বাসায় রহস্যময় পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে অসহায় পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখাচ্ছে।

নিচের তলায় সার্বক্ষণিক ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে, যাতে সহমর্মিতা জানানোর জন্যেও লোকজন সেখানে যেতে অস্বস্তিবোধ করে। সরকারের নির্লজ্জ দালালের ভূমিকা গ্রহণকারী পুলিশ কর্মকর্তারা হয়তো ভুলে গেছেন যে তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, দলীয় ঠ্যাঙাড়ে সদস্য নন। বর্তমান সরকার পুলিশ এবং আদালতকে ব্যবহার করে ভিন্নমত দলন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণের অতিশয় মন্দ নজির রেখে যাচ্ছে। ইলিয়াসের পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার আয়ত্তের বাইরে। কেবল মহান আল্লাহতায়ালার কাছে ইলিয়াসের নিরাপত্তা এবং জালিম শাসকদের শাস্তির আবেদন জানাতে পারি।

ইলিয়াসের মেয়ের জন্মদিনের দুই দিন আগে আর এক হতভাগ্য শিশু মেঘের জন্মদিন ছিল। এ বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে অসহায় মেঘকে পাশের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে ঘাতকরা বড় নির্মমভাবে তার বাবা ও মাকে হত্যা করেছে। সাগর এবং রুনি দু'জনই সংবাদমাধ্যমের কর্মী ছিলেন। রুনির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালীন ইত্তেফাকের জ্বালানি বিটের সাংবাদিক সাগর সরওয়ারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। একবার যমুনা নদীর নাব্য হ্রাস পাওয়ায় তেলবাহী ট্যাংকার চলাচলে বিঘ্ন ঘটার কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সঙ্কটের সময় উত্তরবঙ্গে সরেজমিন প্রকৃত অবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম। অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে সাগরও আমার সফরসঙ্গী হয়েছিল। খুবই স্বাধীনচেতা রূপেই সেদিন তাকে দেখেছিলাম। সফর থেকে ফিরে এসে আমার অধীনস্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে খানিকটা সমালোচনামূলক রিপোর্টই সে করেছিল। তারপরও আমার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় ছিল, কারণ ছেলেটির সততা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

সেই সাগর এবং তার সংবাদকর্মী স্ত্রী রুনি তাদেরই শয়ন কক্ষে আজ পর্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা খুনিদের উপর্যুপুরি ছুরির আঘাতে নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের পাকড়াও করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। পুলিশের বড় কর্তা হাসান খন্দকার তদন্তে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতির গল্প শুনিয়েছিলেন। ডিবি পুলিশ জাতিকে এমন ধারণা দিয়েছিল যে, হত্যাকাণ্ডের মোটিভ জানা গেছে, কেবল অপরাধীদের গ্রেফতার বাকি। খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রশাসন এ বিষয়ে লেখালেখি বন্ধ করার জন্য আদালতকেও ব্যবহার করেছে। বিতর্কিত এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক তিরস্কৃত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সংবাদপত্রে লেখালেখি বন্ধ করার অপচেষ্টা নিয়ে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক নাটক শেষে তদন্তভার ডিবি ও সিআইডি'র হাত থেকে নিয়ে র‍্যাবের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। র‍্যাব অনেক ঘটা করে হত্যার এতদিন পর সাগর-রুনির লাশ কবর থেকে আবার তুলে ভিসেরা পরীক্ষা করলেও হত্যা রহস্যের কোনো কূলকিনারা আজও হয়নি। মাঝখান থেকে কুৎসিতভাবে রুনির চরিত্র হননের অপচেষ্টা করা হয়েছে।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে তদন্ত ব্যক্তিগতভাবে দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই তদন্ত সম্পর্কে মন্তব্যকালে আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বিদেশের মাটিতে বসে সরকারের ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। খুনিবাহিনী কতটা শক্তিশালী হলে এত বড় চাঞ্চল্যকর হত্যা তদন্ত এভাবে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব, সেটা সহজেই অনুমেয়। ফেসবুক, ব্লগ, ইন্টারনেট নিউজ মিডিয়ায় হত্যার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গকে জড়িত করে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি হৃদয়হীন উক্তির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দৃশ্যত বিরক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হত্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, কারও বেডরুম পাহারা দিতে পারব না। এ যুগের শাসক শ্রেণীর আত্মম্ভরিতাপূর্ণ চরিত্র প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের শাসকদের সঙ্গে আজকের ক্ষমতাবানদের এখানেই পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে পুরনো দিনের এক খলিফার গল্প বলি। উমাইয়া বংশের খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং দামি পোশাক ব্যবহার করতেন। খলিফা হওয়ার পর তার ওজন দ্রুত কমতে শুরু করে। দামি পোশাকের স্থলে তার শরীরে তালি দেয়া জামা শোভা পেতে থাকে। একদিন তার উদ্বিগ্ন স্ত্রী ওজন কমার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে খলিফার কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ জবাবে বললেন, ফোরাত নদী তীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে থাকে তাহলেও শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে; সেই দুশ্চিন্তায় আমার শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে। ওমর বিন আবদুল আজিজের

www.pathagar.com

মা খোলাফায়ে রাশেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হযরত ওমরের (রা.) দৌহিত্রী ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যাদের সামান্য লেখাপড়াও আছে, তারাই জানেন হযরত ওমরের (রা.) শাসনব্যবস্থা কতটা উচ্চমানের ছিল। আমাদের দেশের একশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে চরম ইসলাম বিদ্বেষ রয়েছে। তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস চর্চা করতে আবেদন জানাব। মেঘের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এ মাসের ১৬ তারিখে ছয় বছরে পা রেখেছে সাগর-রুনির শিশুপুত্র মেঘ। এবারের জন্মদিনে কেক কাটা হয়েছে নানী বাড়িতে। সেখানেই সে এখন রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গেছে, নিরানন্দ জন্মদিনের সারাটি দিন মেঘ বড় চুপচাপ কাটিয়েছে। আপনজনদের বলেছে তার মন খুব খারাপ। সাগর-রুনি হত্যার পর মিডিয়ার কাছে তার দায়িত্ব নেয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মেঘের জন্মদিনে কোনো কেক তো আসেনি এতিম শিশুটির কাছে। শিশুটির কথা প্রধানমন্ত্রীর কি আদৌ কখনও মনে পড়ে? আসলে এসব দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা রাজনৈতিক স্টান্টবাজি মাত্র। প্রকৃত আপনজনদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদেরকে উদ্দেশ করেই মেঘের খালা ফেসবুকের মাধ্যমে মেঘকে লেখা পত্রে বলেছেন, 'এরা টিভি ক্যামেরার সামনে বড় বড় কথা বলে, দায়িত্ব নেয় না।'

ইলিয়াসের স্মৃতি বড় পীড়া দিচ্ছে। আমি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইলিয়াস সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রাখত। দু'সপ্তাহে অন্তত একবার আমার দেশ কার্যালয়ে এসে সবার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যেত। এমনকি বিদেশে থাকলেও ফোন করে তার কাজের বর্ণনা দিত। প্রধানত ওরই আগ্রহে এবং ব্যবস্থাপনায় সিলেট থেকে জাফলং সীমান্ত পর্যন্ত ভারতীয় ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা সহস্রাধিক গাড়িবহর নিয়ে সফল লংমার্চ করেছিলাম। টিপাইমুখ বাঁধের বিষয়েও সে সর্বদা সোচ্চার ছিল। ভারতের এদেশীয় সেবাদাসরা এই দেশপ্রেমিক, লড়াকু চরিত্রের জন্যই তাকে টার্গেট করল। জানি না এরপর গুমের তালিকায় কারা রয়েছেন। তবে আশার কথা, সিলেটের স্থানীয় অধিবাসীরা এখনও তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি আশাবাদী, এই রহস্যের কিনারা একদিন হবেই। সচরাচর আমি দীর্ঘ কলাম লিখতে অভ্যস্ত। আজ সাগর-রুনি, মেঘ, ইলিয়াস, নাওয়াল, আমিনুল ইসলাম, চৌধুরী আলমের প্রসঙ্গ মনটাকে বড় বিষণ্ন করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীন মহলের খুনিদের ধিক্কার জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

২৭ জুন ২০১২

www.pathagar.com

নির্বাচনী ভাবনা

গত সপ্তাহে পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারি নিয়ে লিখেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতই রাগান্বিত হন না কেন, সরকারের দুর্নীতির সেই চর্চা এখনও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সমানতালে চলছে। রাগের চোটে সংসদে বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি আমাকে জোট সরকারের বিদ্যুৎ উপদেষ্টাও বানিয়ে ফেলেছেন। আমি বিদ্যুৎ নয়, সরকারের মেয়াদের মাত্র শেষ ষোল মাস জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলাম। উইকিলিক্স-এর কাগজপত্র ঘাঁটলে প্রধানমন্ত্রী সেখানে আমার সময়কালীন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সততা ও স্বচ্ছতার বর্ণনাই দেখতে পাবেন। যাই হোক, আমি আজ আর 'সর্বনাশা' পদ্মা সেতু নিয়ে লিখতে বসিনি। বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি বাতিলের আগে কেন জানি না দেশে একটা আগাম নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সে বিষয়েই আমার আজকের মন্তব্য প্রতিবেদন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এখনও দেড় বছর বাকি থাকলেও দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক শিবির থেকে নির্বাচনবিষয়ক বক্তব্য দেয়ার প্রবণতা সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতাকালে আগাম ভোট চাইতে শুরু করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া ভোট চাওয়া পর্যন্ত না গেলেও বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এবার কী করবে তার রূপরেখা অন্তত দিচ্ছেন। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও জেল থেকে মুক্তির পর থেকে তুলনামূলকভাবে আন্দোলনের চেয়ে নির্বাচন নিয়েই অধিক কথাবার্তা বলছেন। মাঝখানে রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক বায়বীয় তৃতীয় শক্তি সম্পর্কে তার বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ খানিকটা বিতর্কও উসকে দিয়েছিল।

আগামী নির্বাচনে কোন দল কত আসন পাবে, সেই আলোচনার সূত্রপাত অবশ্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘটিয়েছেন। আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে ১৭০ থেকে ১৭৫ আসন পেয়ে পুনরায় সরকার গঠন করবে এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী তার কাছ থেকে আমরা এর মধ্যে শুনেছি। জনগণ পদ্মা সেতু দুর্নীতি সম্পর্কে জেনে যাওয়ার পর সেই আসন সংখ্যা কোন অবস্থায় আছে, সেটা প্রধানমন্ত্রীই ভালো জানেন। সরকার প্রধানের কাছে তথ্যের ভাণ্ডার থাকার কথা। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডিজিএফআই) এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসআই) ছাড়াও দেশি-

www.pathagar.com

বিদেশি নানা সূত্র থেকে তিনি নিয়মিত তথ্য পেয়ে থাকেন। ১৭৫ আসনের তথ্য কোথা থেকে এসেছে, সেটি আমজনতার জানার উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো বক্তব্য আমাদের গুরুত্বের সঙ্গেই নেয়া উচিত। তবে, এই হিসাব-নিকাশের একটি বিষয় আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করেছে। মাত্র কিছুদিন আগে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকার প্রধানদের জনপ্রিয়তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালআপ (Gallup) তাদের আবিষ্কার প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেছে। সেই বিস্ময়কর আবিষ্কারে তারা দাবি করেছে, শেখ হাসিনাকে এখনও নাকি বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ জনগণ সমর্থন করে।

গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। বিএনপি পেয়েছিল ৩৩ শতাংশ ভোট এবং জামায়াতের ভাগে পড়েছিল ৪ শতাংশ। অর্থাৎ গ্যালআপের জরিপ বিশ্বাস করলে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সব সমর্থক তো বটেই, এমনকি বিএনপি ও জামায়াতের অন্তত ১৪ শতাংশ সমর্থক এই সাড়ে তিন বছরে আওয়ামী ক্যাম্পে চলে গেছে! সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সিটসংখ্যা গত নির্বাচনের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। অথচ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাদের আসন সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৫০টি পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তাহলে ধরে নিচ্ছি, গ্যালআপের এই গাঁজাখুরি জরিপে স্বয়ং শেখ হাসিনাই বিশ্বাস করেন না। থাকগে, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কোন দল কত আসন পাবে, সে বিষয়ে লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ নির্বাচন আদৌ হচ্ছে কি না, আর হলেও সেটা বিএনপি'র ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মার্কা নির্বাচন হবে কিনা, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজারই চেষ্টা করছি।

পঞ্চদশ সংশোধনীর পর মহাজোট সরকার সংবিধানের যে বেহাল অবস্থা করে ফেলেছে, তাতে আর একটি সংশোধনী না হলে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবর্তে আমরা বড়জোর ১৯৭৩ সাল মার্কা একটা নির্বাচন আশা করতে পারি। দেশের জনগণের মধ্যে পঞ্চাশের উপরে যাদের বয়স, তাদের সেই নির্বাচনের স্মৃতি উজ্জ্বলই থাকার কথা। আজকের মহাজোটের ডাকসাইটে বামনেতা রাশেদ খান মেননকেও ওই নির্বাচনে শেখ মুজিব প্রশাসন প্রকাশ্য কারচুপির মাধ্যমে হারিয়ে দিয়েছিল। অন্য পরাজিতদের কথা আর নাই বললাম। একটি বিষয়ে শেখ মুজিবের প্রশংসা করতে হবে। তিনি পাঁচ মিনিটে বাকশাল করা সাহসী মানুষ ছিলেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে কোনোরকম গোপনীয়তার ধার ধারতেন না। তার আমলে তাই ভোট ডাকাতিও দিনে-দুপুরে জনগণের চোখের সামনেই হয়েছিল। তার কন্যাও পিতার কাছ থেকে এই গুণটি

www.pathagar.com

পেয়েছেন। আর যাই হোক, সিদ্ধান্তহীনতার অপবাদ শেখ হাসিনাকে কেউ দিতে পারবে না।

পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণয়নের জন্য গঠিত সংসদীয় কমিটির প্রত্যেক সদস্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে থাকলেও এক ধমকে তিনি সেই পদ্ধতি তাদের দিয়েই বাতিল করিয়েছেন। দেশের সাধারণ জনগণ তাতে কী মনে করল, এতে শেখ হাসিনার কিছু যায় আসে না। তিনি জানেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যা চাইবে সেটাই সঠিক। শেখ হাসিনা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সহিংস আন্দোলন করছিলেন, তখন আওয়ামীপন্থী মিডিয়ার কল্যাণে সেটাই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল। আবার আজ যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা আওয়ামী লীগের স্বার্থের অনুকূল নয়, তখন ১৮০ ডিগ্রি উল্টো দিকে অবস্থান নিয়ে অনির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে হুক্কা হুয়া রব তুলে তাল দেয়ার জন্য তথাকথিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, সুশীলের (?) অভাব হচ্ছে না। যে বিদেশি গোষ্ঠী একসময় তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি মেনে নেয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল, তারাই এখন শেখ হাসিনার দোর্দণ্ড প্রতাপের সামনে মিনমিন করে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার আহ্বান জানাচ্ছেন।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে তারা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন, সমস্যা সমাধানের প্রধান দায়িত্ব সর্বদাই সরকারি দলের। আর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায়, তখন দায়িত্বটা আশ্চর্যজনকভাবে ভাগাভাগি হয়ে সরকার ও বিরোধী দল উভয়পক্ষের হয়ে যায়। দ্বিমুখী নীতি আর কাকে বলে! আওয়ামী লীগ যখন বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এবং লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে বেশুমার মানুষ হত্যা করে, তখন সেটা হয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। আর বিএনপি'র ডাকা হরতালে একটি-দু'টি বাসে ভাংচুর চালানো হলে অথবা আগুনে পোড়ালে তা অবশ্যই ভয়ঙ্কর নাশকতা। সেই নাশকতার অপরাধে (?) হুকুমের আসামি হয়ে দলটির মহাসচিব, স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতাসহ শত শত নেতাকর্মীকে দ্রুত বিচার আইনের মামলায় কারাগারেও যেতে হয়। রিমান্ডের ভয়ে দলটির শীর্ষ নেতারা আবার আত্মগোপনও করেন। বিচিত্র এই দেশে সময়-সুযোগমত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংজ্ঞাই পাল্টে যায়।

গত সাড়ে তিন বছরের ধাঁচে বিএনপি আগামী দেড় বছরও থেমে থেমে আন্দোলন করলে তাদের দাবি পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। বিদেশি চাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে তখন রাষ্ট্রপতিকেই হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বানিয়ে রিমোট কন্ট্রোলে সরকার পরিচালনার চেষ্টা

www.pathagar.com

করা হবে। অর্থাৎ দেশবাসী ইয়াজউদ্দিন সরকারের তুলনায় একটি অধিকতর দলীয় নির্বাচনকালীন সরকার দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে চলেছে। সে রকম পরিস্থিতিতে বিএনপি'র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিঃসন্দেহে আত্মঘাতী হবে। সরকার অবশ্য ডিজিএফআইকে ব্যবহার করে বিএনপিতে ভাঙন ধরিয়ে পাল্টা বিএনপি তৈরি করার কৌশল নিতে পারে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মূল স্রোতের বাইরে গিয়ে এ যাবত কোনো রাজনীতিবিদই, তা তিনি যত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন না কেন, সফল হতে পারেননি। সুতরাং বিএনপি'র নীতিনির্ধারকদের দলে ভাঙনের ব্যাপারে অযথা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ দেখি না। এক এগারোতে ডিজিএফআই-এর ইশারায় বিএনপি'র যেসব নেতা রাতারাতি সংস্কারপন্থী সেজেছিলেন, তাদের অধিকাংশই রীতিমত নাকে খত দিয়ে পরে দলে ফিরেছেন। যাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা না করার ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়া এখনও অনড় রয়েছেন, তারা চেয়ারপার্সনের মন গলানোর জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বপদে বহাল রেখে অথবা দলীয় রাষ্ট্রপতির অধীনে যে কোনো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে বিএনপির অটল থাকাটাই সঠিক হবে বলে আমার ধারণা। সেই একতরফা নির্বাচনে গৃহপালিত বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের জন্য অবশ্য উদগ্রীব হয়ে আছেন পতিত স্বৈরাচার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। অর্থাৎ আগামীতে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনেরই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাব, যেখানে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির মধ্যে অবস্থানের পাল্টাপাল্টি ঘটবে। জেনারেল এরশাদ এবং শেখ হাসিনার এই যৌথ রাজনৈতিক খেলা দেশবাসী বিগত তিন দশক ধরে দেখে আসছে। ইতিহাস অবশ্য সাক্ষ্য দেয়, এ ধরনের নির্বাচন দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পায় না বিধায় সংসদ স্বল্পকালীন হয়ে থাকে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করলেও এবার তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকে মাইনাস বিএনপি জামায়াতকে নির্বাচনমুখী করার চাপ হিসেবেও ব্যবহার করা হতে পারে। আওয়ামী লীগের নীতি হলো, জামায়াত তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে তখন যুদ্ধাপরাধ 'পবিত্র' গঙ্গাজলে ধুয়ে-মুছে যেতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের 'সোল এজেন্সি'র দাবিদার দলটির এই চরম সুবিধাবাদী চরিত্র আমরা ১৯৮৬ এবং ১৯৯৬ সালেও দেখতে পেয়েছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিষয়ে জনমত অবশ্য এখন সর্বতোভাবে বিএনপির পক্ষে। আগেই উল্লেখ করেছি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলেই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংবিধান থেকে বর্জন করা হয়েছে। তার এই সিদ্ধান্তে দেশের অধিকাংশ নাগরিক ক্ষুব্ধ

www.pathagar.com

হয়েছেন। সচরাচর আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল সুশীল (?) সমাজভুক্ত ব্যক্তিরাও একবাক্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি রেখে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এমনকি যে প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক তত্ত্বাবধায়ক বাতিলে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তিনিও সম্প্রতি গণমাধ্যমের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে আরও দুই মেয়াদ এই পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনার পক্ষেই অভিমত দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের সংক্ষিপ্ত রায়ে (Short Judgement) আদালতের পর্যবেক্ষণ (Observation) রূপে যা বলা হয়েছে, সেটিও সর্বোচ্চ আদালতের আদেশেরই অংশ। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এতদিন পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছিল যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের অংশটুকু কেবল আদালতের রায় এবং অবশ্য পালনীয়। সংক্ষিপ্ত রায়ের বাকি অংশ যেখানে জনস্বার্থে আরও দুই মেয়াদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, সেই অংশটি যেহেতু পর্যবেক্ষণ মাত্র, কাজেই শেখ হাসিনার মতানুসারে সেটি পালন করা আবশ্যকীয় নয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের সাক্ষাৎকারের পর শেখ হাসিনার আষাঢ়ে যুক্তি আর ধোপে টিকছে না।

এদিকে খায়রুল হকের রায় লেখা নিয়ে অন্য এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণতম আইনজীবী জাস্টিস টিএইচ খান ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের প্রদত্ত এক রায়ের আলোকে বলেছেন, অবসর গ্রহণের পর কোনো বিচারপতির রায় লেখা আইনসিদ্ধ নয়। বিচারপতি খায়রুল হক ২০১১ সালের ১৭ মে তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। জাস্টিস টি এইচ খানের মতে অবসর গ্রহণ পরবর্তী দশ মাস ধরে লেখা বিচারপতি খায়রুল হকের রায় অবৈধ; কারণ তিনি তখন আর বিচারপতির শপথের অধীনে ছিলেন না। বাংলাদেশের বিচারপতিদের মধ্যে অবসর গ্রহণের পরও রায় লেখার প্রবণতা বিচারপতি টি এইচ খানের এই ব্যাখ্যার পর কমে যাবে বলে আশা করছি।

নির্বাচন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এ দেশের বাস্তবতায় অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নেই। বিএনপি'র পক্ষ থেকে সেই সরকারের নামের ব্যাপারে এর মধ্যে ছাড় দেয়া হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া একাধিকবার বলেছেন যে, সেই সরকারকে তত্ত্বাবধায়কের পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন নামে অভিহিত করা হলেও তার কোনো আপত্তি নেই। তবে অবশ্যই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হতে হবে। অপরদিকে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের কোনোক্রমেই নির্বাচনকালীন অস্থায়ী সরকারে ঠাঁই দিতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই বিবাদের নিষ্পত্তি আলোচনার টেবিলে ঘটার কোনো সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে কোনো সরকারই কার্যকর আন্দোলন ব্যতিরেকে বিরোধী দলের দাবি কখনও মেনে নেয়নি। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮, দুই দফায় এরশাদের একতরফা সংসদ

www.pathagar.com

বৈধতা পায়নি, কারণ বেগম খালেদা জিয়া জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গণ-আন্দোলনে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে একতরফা নির্বাচন করেও বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে পারেনি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সফলতার জন্যই। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ নির্দেশিত (!) সেনা অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি হতেও মহাজোটের সহিংস ও সফল আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল। তাদের আন্দোলনের চাপে বিএনপি রাজপথ থেকে সরে পড়াতেই শেষ পর্যন্ত ২২ জানুয়ারির নির্বাচন করতে সক্ষম হয়নি। বিদেশি রাষ্ট্রগুলোও তখন একাট্টা হয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থানকেই সমর্থন জানিয়েছিল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতেও তীব্র আন্দোলন ছাড়া বিএনপির দাবি আদায় অসম্ভব।

গত সাড়ে তিন বছরে একমাত্র ইলিয়াস আলী ইস্যুতেই বিরোধী দলের আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তীব্রতায় সরকার প্রথম বারের মতো পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারি দলের মধ্যে যে ক'জন নেতা সচরাচর গণমাধ্যমে দলীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাদের বক্তব্যের মধ্যেও যথেষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এমন অবস্থায় হিলারি ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের অনেকটা আকস্মিকভাবে আন্দোলনে বিরতি দেয়ার সিদ্ধান্ত ক্ষমতাসীনদের পরিস্থিতি সামলে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার বিনিময়ে বিএনপির প্রাপ্তি কী হয়েছে, সেটি দলটির নীতিনির্ধারকরাই ভালো জানেন। তবে, মহাসচিবসহ বিএনপির শীর্ষ নেতাদের একটা বড় অংশকে বানোয়াট মামলায় নজিরবিহীনভাবে জেলে পোরা হলেও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর নীরবতা সবাইকে বিস্মিত করেছে। যতদূর স্মরণে আসে, ১৯৯৫-৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন চলাকালে তোফায়েল আহমেদসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকে কয়েক দিনের জন্য গ্রেফতার করা হলে বারিধারা-গুলশানের কূটনীতিকরা কঠোর বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে তৎকালীন বিরোধী দলের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন। সম্ভবত কোনো কোনো কূটনীতিক গ্রেফতার হওয়া নেতাদের বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে তাদের পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দিয়েও এসেছিলেন। এ জাতীয় আচরণের মাধ্যমে কূটনীতিকবৃন্দ সেই সময় ক্ষমতাসীন বিএনপিকে সঙ্কেত দিয়েছিলেন যে, কোনো একতরফা নির্বাচন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আশ্চর্যজনকভাবে এবার দেখা গেল বিএনপি নেতারা অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হলেও কূটনীতিকবৃন্দ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। নেতৃবৃন্দের স্বজনদের সান্ত্বনা দেয়া তো দূরের কথা, সরকারের ফ্যাসিস্ট আচরণের কোনো প্রকাশ্য নিন্দা পর্যন্ত তারা জানালেন না।

www.pathagar.com

আমার ধারণা, পশ্চিমাদের পছন্দের তালিকায় প্রথমেই এদেশের সুশীল (?) গোষ্ঠী এবং তার পরের স্থানটি আওয়ামী লীগের দখলে। বিএনপি'র রাজনৈতিক দর্শনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকার কারণে এই দলটি পশ্চিমা নিওকনদের (Neo-con) বিরাগভাজন হয়েই আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা অধিকাংশ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে নিও কনরা এখনও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং বিদেশি বন্ধুদের তোষণের পরিবর্তে নিজ দেশের জনগণের ওপর আস্থা রাখলেই বরঞ্চ বিএনপি'র পক্ষে ক্ষমতাসীন, অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব হবে।

মিসরের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। অনেক জুলুম, নির্যাতন সহ্য করেও আন্দোলন অব্যাহত রাখার ফলেই শেষ পর্যন্ত মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা ড. মোহাম্মদ মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করতে পেরেছেন। কার্যকর এবং অব্যাহত আন্দোলন ব্যতিরেকেই জাতীয়তাবাদী দলের যে গোষ্ঠী বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রিত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন, তারা সম্ভবত না বুঝেই সরকারের সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন। সরকারের একের পর এক দুর্নীতির কাহিনী দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঝুঁকি নেবেন, এতটা আশাবাদী আমি অন্তত হতে পারছি না। ভবিষ্যতে বিরোধী নেত্রীর ভূমিকা পালন করা শেখ হাসিনার পক্ষে বোধহয় আর সম্ভব নয়। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন জনগণকে ঈদের পর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। আমার ধারণা, জনগণ প্রস্তুত হয়েই আছে। তবে চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে জাতীয়তাবাদী জোটের মানসিক দৃঢ়তা ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে দেশবাসী অবশ্যই নিশ্চিত হতে চাইবে। বার বার আন্দোলনে বিরতি দেয়ার বিচিত্র কৌশল দ্বারা জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জনগণ আশা করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এবার অন্তত চূড়ান্ত বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা মাঠ ছাড়বেন না। তবে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত বিশ্বে কোথাও মুক্তি অর্জন করা যায়নি। সুতরাং, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরাচারী শক্তির অপশাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্যও রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণ জনগণ নির্বিশেষে সেই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অভ্যন্তরীণ বিবাদে জর্জরিত বিএনপি'র কতজন নেতা সেই আত্মত্যাগে প্রস্তুত রয়েছেন, সেটাই প্রশ্ন।

১১ জুলাই ২০১২

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর লন্ডন বার্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৫ জন সঙ্গী-সাথীর বিরাট বহর নিয়ে লন্ডন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করে দু'দিন আগে দেশে ফিরেছেন। এবারের অলিম্পিকে মাঠে বাংলাদেশের প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৫ জন। তাদের দেখভাল করার জন্য ২২ জন কর্মকর্তার এক বিশাল বহর লন্ডনে গেছে! আর খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের উৎসাহ দিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য ঘুরে এলেন ৫৫ জন সঙ্গী নিয়ে। আমার ধারণা, এমন কাণ্ড কেবল বাংলাদেশেই ঘটতে পারে। পুত্রসহ বিদেশে বসবাসকারী পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে লন্ডনে দেখা হওয়ায় ধারণা করছি, ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর ৫ দিনের অবকাশ যাপন আনন্দেই কেটেছে। বিশেষ করে পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্মদিন পালনের সুযোগ নিশ্চয়ই মা হিসেবে শেখ হাসিনার জন্য বাড়তি পাওয়া ছিল।

তবে বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার একটি নালিশ আছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থ জোগানের জন্য যেখানে শিশুদের পর্যন্ত টিফিনের পয়সা বাঁচাতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, সে অবস্থায় জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রধানমন্ত্রীর অলিম্পিক দেখার বিলাস ত্যাগ করাটা বরং শোভনীয় ছিল। যাই হোক, আনন্দ ভ্রমণ শেষে প্রধানমন্ত্রী এখন আবার পূর্ণোদ্যমে দেশের উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। শেখ হাসিনার এই মেয়াদের প্রধানমন্ত্রিত্বের আর খুব একটা সময় অবশিষ্ট নেই। প্রতিহিংসাপরায়ণতা, গুম, ক্রসফায়ারসহ নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচার বিভাগসহ সর্বত্র নির্বিচার দলীয়করণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ এবং সর্বোপরি বল্গাহীন দুর্নীতির জন্য মহাজোট সরকারের বর্তমান শাসনামল দেশে ও বিদেশে একবাক্যে নিন্দিত হয়েছে। দেখা যাক বাকি সোয়া বছরে সরকার তার ক্ষয়প্রাপ্ত বিকট ভাবমূর্তির খানিকটা অন্তত মেরামত, চুনকাম, ইত্যাদি করতে পারে কি না। যাকগে, এবারের লন্ডন সফরে মিডিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন, তারই কয়েকটি নিয়ে এ সপ্তাহের মন্তব্য-প্রতিবেদন লিখতে বসেছি।

www.pathagar.com

পদ্মা সেতু : বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে পদ্মা সেতু নির্মাণ কৌশল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত দৃশ্যত বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছেন। ২৫ জুলাই পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন সম্ভাবনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী এক সরকারি তথ্য বিবরণী প্রকাশ করেন। সেই আনুষ্ঠানিক দলিলে পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতি না করার প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক বিশ্বব্যাংককে পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বশংবদ আমলা, কথিত স্বাধীন দুদক চেয়ারম্যান গোলাম রহমানও তার আগের অবস্থান থেকে ইউটার্ন দিয়ে 'কাকতালীয়ভাবে' একই দিনে সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, তিনিও এখন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারির যৌথ তদন্তে সম্মত আছেন।

এই গোলাম রহমান জুলাই মাসের ১ তারিখে সরকারের প্রায় প্যারালাল (parallel) অ্যাটর্নি জেনারেলের ভূমিকা পালনকারী সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আনিসুল হককে পাশে বসিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেদিন দু'জনই আইনের নানারকম ভাষা প্রয়োগে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতি তদন্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অ্যাডভোকেট আনিসুল হকের বক্তব্য ছিল, 'কিন্তু, বিশ্বব্যাংক এক্সটার্নাল প্যানেল অব ইনভেস্টিগেটিভ এক্সপার্ট নিয়ে এলো। আমরা বললাম, আমাদের আইনে এটা হয় না। আমরা বিশ্বব্যাংককে তথ্য দিতে পারি। কারণ তারা আমাদের কাছে নালিশ করেছে। আমাদের আইনে আছে যে, আমাদের যে তদন্ত সেটা আমরা জানাতে বাধ্য। কিন্তু অ্যাডভাইজারি কমিটিতে নয়।' কী আশ্চর্য, মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের চাপের কাছে দুদককে নতিস্বীকার করতে আইন আর বাধা হয়ে দাঁড়াল না!

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পত্র-পত্রিকায় খবর বের হলো যে, ওই দিনেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঋণ বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আরজি জানিয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছে। আমরা ভাবলাম বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বোধহয় তলে তলে একটা রফা হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিদেশ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল সরকার হয়তো বিশ্বব্যাংকের যাবতীয় শর্ত পূরণে রাজি হয়েছে। অদ্ভুত বাংলায় কাব্য করে কথা বলায় খ্যাত বর্তমান যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আবেগের ঠেলায় মন্তব্য করলেন, পদ্মা সেতুতে বসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার দিন খুব দূরে নয়। দেশবাসী আর এক জ্যোৎস্নাপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদকে আবিষ্কার করে ধন্য হলেন। কিন্তু, দেশবাসীকে চমকে দিয়ে

www.pathagar.com

অর্থমন্ত্রীর নতুন উদ্যোগ এবং ওবায়দুল কাদেরের কাব্যিক আবেগে বরফ ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিতে ২৪ ঘণ্টাও সময় নিলেন না স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৫ জুলাই সকালেই লটবহর নিয়ে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে উড়ে গিয়েছিলেন। বিকেলে লন্ডন পৌঁছে সন্ধ্যাতেই সেখানে বাংলা ভাষাভাষী সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বোমা ফাটানো বক্তব্য রাখেন। দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে সদ্য পদত্যাগী, দেশে-বিদেশে মহা-বিতর্কিত মন্ত্রী আবুল হোসেনকে তিনি একেবারে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেট দেন। এ রকম একজন সাহসী ও প্রকৃত দেশপ্রেমিককে কেন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হলো, সে বিষয়ে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী কোনো মন্তব্য করেননি।

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে পদ্মা সেতু প্রকল্পে কাজ দেয়ার তদবির করার অভিযোগ আনেন এবং পার্সেন্টেজ খাওয়ার দাবি করেন। অবশ্য বিশ্বব্যাংকের কোন কর্মকর্তা পার্সেন্টেজ খেতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়টি শেখ হাসিনা আর খোলাসা করেননি। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত যখন বিশ্বব্যাংকের ঋণ পাওয়ার জন্য লজ্জা-শরম শিকেয় তুলে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর বিষোদগার বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার তীব্র মতবিরোধের চিত্রকেই বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দেশবাসীকে চমকে দেয়া এই কার্যকলাপে অনুমিত হচ্ছে যে, তিনি আর পদ্মা সেতু প্রকল্পে উৎসাহী নন। নইলে অর্থমন্ত্রীর সর্বশেষ উদ্যোগকে এভাবে ভেস্তে দিতে পারতেন না। প্রশ্ন হলো, দরিদ্র দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নবিরোধী এমন হঠকারী ভূমিকায় কেন অবতীর্ণ হয়েছেন? নিন্দুকরা বলছে যে, তিনি কিছুতেই বিশ্বব্যাংকের যৌথ তত্ত্বাবধানে পদ্মা সেতু দুর্নীতির তদন্ত মেনে নিতে পারছেন না। এখানে উল্লেখ্য, নিক্সন চৌধুরী নামের যে ব্যক্তিকে দুদক ইতোমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে শোনা যায়, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপন ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে। বিশ্বব্যাংক তদন্ত করলে এই তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যে, নিক্সন চৌধুরী কি ঘুষের অর্থ নিজে নিচ্ছিলেন, নাকি তিনি সরকারের আরও শীর্ষ পর্যায়ের কারও এজেন্ট হিসেবে কানাডীয় প্রতিষ্ঠান এসএনসি লাভালিনের সঙ্গে লেনদেন করেছেন? স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁসের এমন ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়া সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঘটনার এই নাটকীয়তার প্রেক্ষাপটে যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে অন্তত একজন অথবা উভয়কে গত সাত দিনে পদত্যাগ করতে

www.pathagar.com

হতো। কিন্তু, বাংলাদেশ বলে কথা! প্রধানমন্ত্রীর উষ্মা আমলে নিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত পরদিন রাগত কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানালেন, ইআরডি থেকে বিশ্বব্যাংকের কাছে কোনো পত্র নাকি প্রেরণ করা হয়নি। এসব আজগুবি সংবাদ প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের ওপর খানিকটা রাগও ঝাড়লেন বিব্রত অর্থমন্ত্রী। সুতরাং, পদ্মা সেতু আপাতত সেই তিমিরেই। সেতুতে বসে দোল খেতে খেতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে আরও কতদিন বাকি, সেটা যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরই ভালো বলতে পারবেন। এদিকে অবশ্য দুর্নীতির আর এক বরপুত্র, কালো বিড়ালখ্যাত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসানের দাবি করেছেন। হতে পারে তারা হয়তো এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর চাইতেও বেশি ওয়াকিবহাল। হীরক রাজার দেশে আমজনতার গালে হাত দিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী?

ইলিয়াস আলী গুম : বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীর গুম হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, যেভাবে উত্থান সেভাবেই পতন। বিএনপি আমলে চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী নেতা জামালউদ্দিনের গুম প্রসঙ্গ টেনে তিনি ইলিয়াসের গুমের ঘটনাকে প্রকারান্তরে সমর্থন করে দাবি করেন, বিএনপি গুম চালু করে দিয়ে গেছে, এখন রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই ভেবে অবাক লাগে যে, একই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিখোঁজ ইলিয়াস আলীর স্ত্রী ও শিশুকন্যা সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি শিশুটিকে আদর করে তার পিতাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তো শেখ হাসিনা যেভাবে উত্থান সেভাবেই পতনের তত্ত্ব হাজির করেননি। নাকি ইলিয়াসের কন্যার সঙ্গে তার আচরণ কেবল রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ ছিল? আসল মানুষটিকে লন্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালেই শুধু দেখা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে আরও একটি প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। যেদিন ইলিয়াসের পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল, সেদিন কি তিনি নিখোঁজ বিএনপি নেতার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? তিনি কি জানতেন যে ইলিয়াস আলীর পতন হয়ে গেছে? পতনের নির্দেশটিও কি তারই ছিল? যাই হোক, ইলিয়াস আলীর প্রতি না হয় ধরেই নিলাম রাজনৈতিক কারণে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে। সুতরাং ইলিয়াস আলীর গুম হয়ে যাওয়ায় তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত নন এবং তাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো দায়িত্ববোধ তাকে পীড়িত করে না। ঢাকা মহানগরীর বিএনপি নেতা চৌধুরী আলমের গুম হওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারের দায়দায়িত্বের ব্যাপারটি হয়তো

www.pathagar.com

তিনি স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু, ইলিয়াস আলী এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের গাড়ির দরিদ্র চালকদ্বয় অথবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তো 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির' কন্যা, দেশরত্ন ও জননেত্রী উপাধিতে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকার কথা নয়। তাহলে তার আমলে এদেরকে কেন গুম হতে হলো? সরকারের বিশেষ বাহিনীর এই চরম নিন্দনীয় দুষ্কর্মকেও কি প্রধানমন্ত্রী ন্যায্য বলে মনে করেন? তিনি দাবি করছেন, রাতারাতি নাকি অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর রাতারাতি কত বছরে হয়, সেটা আমার জানা নেই। তবে তার সরকারের প্রায় চার বছর যে পার হয়ে গেছে, সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। আমাদের সরকারপ্রধানরা তাদের আমলের সব ব্যর্থতার জন্য পূর্ববর্তী সরকারকে দোষারোপ করার মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। এ দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে আত্মসমালোচনার অভাব দেশকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছে বলেই আমার ধারণা। আমাদের কোনো ভুল হতে পারে না, এ জাতীয় বিকৃত দর্শন থেকে তারা মুক্ত হতে না পারলে দেশের মুক্তিও সুদূর পরাহত। রাজনীতিকরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস করতে পারলে জনগণের অনেক মুশকিল আসান হয়ে যেত।

আগামী নির্বাচন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসীন থেকেই যে দেশে আগামী সাধারণ নির্বাচন করিয়ে ফেলতে চান, এ বিষয়টি বিএনপির কয়েকজন অতি আশাবাদী নেতা ব্যতীত দেশের সবাই বোঝেন। সম্প্রতি তিনি বলতে শুরু করেছেন যে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশেও তাই হবে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে তিনি সম্ভবত ভারত, যুক্তরাজ্য ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। প্রথম কথা হলো ওইসব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে তার শতকরা এক ভাগও বাংলাদেশে আমরা করতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মতো যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখার অসুস্থ মানসিকতা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিকদের নেই। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, গণবিরোধী পঞ্চদশ সংশোধনীর পর বাংলাদেশে কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক নির্বাচন করাই সম্ভব নয়। সংবিধানের বর্তমান অবস্থায় এদেশে নির্বাচনের নামে একটা প্রহসন অনুষ্ঠিত হতে পারে মাত্র, যার মধ্য দিয়ে মহাজোট সরকার আরও ৫ বছর তাদের অপশাসন অব্যাহত রাখার বৈধতা পাবে।

যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নাম শুনলেই ক্ষমতাসীনরা অনেকটা জলাতঙ্ক রোগীর মতো আচরণ করে থাকেন, তারই কাছাকাছি একটি পদ্ধতি পাকিস্তানের মতো সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রও সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

এবং সেক্যুলার সুশীলদের (?) মধ্যে পাকিস্তান নামটিতে এক প্রকার এলার্জি থাকলেও সাম্প্রতিককালে ওই দেশটিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার অন্তত একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার বিপরীতে এক-এগারো পরবর্তী বাংলাদেশে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ধ্বংস করা হয়েছে। নির্লজ্জ দলীয়করণের বিষময় প্রতিক্রিয়ায় আমার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটের অবস্থা দেশবাসী দেখতে পাচ্ছেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সুপরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং দলবাজ উপাচার্য এই ত্রয়ী মিলে কেমন করে ধ্বংস করছেন, এ নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা হতে পারে। যাই হোক, নির্বাচন প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

লন্ডন সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের বিষয়ে তার পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এই অবস্থান থেকে তিনি এক চুলও সরেননি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, সেটি নির্ভর করবে বিরোধী দলের আগামী আন্দোলনের সফলতা অথবা ব্যর্থতার ওপর। সরকারের হাতে এখন অনেকগুলো বিকল্প রয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, স্পিকার আবদুল হামিদ এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের মধ্যে যে কোনো একজনকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব বিরোধী দলের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর কোনো বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করায় বাধা রয়েছে। তবে বাকি তিনজনের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে যারই কিছুমাত্র ধারণা রয়েছে, তিনিই বুঝবেন চারটি বিকল্পেরই মূল কথা কিন্তু অভিন্ন। অর্থাৎ যে কোনো বিকল্পেই নির্বাচনের সময়ে প্রকৃত ক্ষমতা থাকছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার হাতেই। বিএনপি একটি বিকল্পেও সম্মতি না জানালে তখন তাদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির অভিযোগ তোলা অত্যন্ত সহজ হবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে নির্বাচনের বাইরে রেখে লে. জে. এরশাদকে দিয়ে গৃহপালিত বিরোধী দল সৃষ্টি করারও একটা সুযোগ শেখ হাসিনা গ্রহণ করতে পারেন। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যে সেই অপচেষ্টায় ২০০৭ সালের মতো শক্তভাবে বাধা দেবে, সেরকম আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আগামী বছর মার্চে একটি আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনার কথাও বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসদ ভেঙে দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখে একটি ক্ষুদ্রকায় স্বল্পকালীন মন্ত্রিসভার অধীনে নির্বাচন হওয়াও অসম্ভব নয়। সরকারি দলের এতগুলো বিকল্পের বিপরীতে বিরোধী দলের করণীয় আমি অন্তত মাত্র একটিই দেখতে পাচ্ছি। গত পৌনে চার বছরে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পিঠ দেয়ালে ঠেকে

www.pathagar.com

গেছে। যেসব বেশুমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাজোট জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছিল, সেগুলোর কোনোটি বাস্তবায়নের পরিবর্তে তারা স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। একটিমাত্র ডিমের দাম ১০ টাকা, এক হালি কলার দাম ৫০ টাকা, এই দ্রব্যমূল্যের চাপ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া দামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুতের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। সুতরাং, জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল করা ভিন্ন বিরোধী দলের হাতে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। ২০১৩ সালের অন্তিম লগ্নে সময়-সুযোগমত আন্দোলনের আশায় বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বসে থাকলে তাদের হয়তো কষ্ট করে আর কোনো আন্দোলন করার প্রয়োজনই পড়বে না। লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলে দলটির সাময়িক অবকাশ তখন চিরস্থায়ী অবকাশে রূপ নিতে পারে।

পাদটীকা : লন্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে নৈশভোজ শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গানের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। খানিকটা আদিরসাত্মক গানটি হলো, কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে শ্যামে পাইলো ভ্রমরা, ময়ূর বেশেতে সাজন রাধিকা। প্রধানমন্ত্রী যখন গানটি গাওয়া শুরু করেন, তখন তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতারাও নাকি কণ্ঠ মিলিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের উদ্দাম প্রেম সম্পর্কিত গান একজন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে গাইতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তুলে লাভ নেই। তার রুচিবোধ যে ভিন্ন প্রকৃতির, সে প্রমাণ তিনি সংসদে বহুবার রেখেছেন।

একমাত্র আমার দেশ ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মিডিয়া প্রধানমন্ত্রীর গান গাওয়ার সংবাদটি সেলফ সেন্সর করেছে। বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত মিতভাষী একজন রাজনীতিবিদ। তার সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এমন কাণ্ড তার পক্ষে ঘটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু, তিনি যদি এরকম কোনো আচরণ করেই ফেলতেন তাহলে বাংলাদেশের কতগুলো পত্রিকায় সেই সংবাদ শিরোনাম হতো, সেটাই ভাবছি। আমার দেশ পত্রিকা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার ওপর প্রধানমন্ত্রী কি সাধ করে রুষ্ট হন?

১ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

মধ্যবিত্তের দিনযাপন

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহারটি প্রকাশ করেছিল, তার বাহারি নাম দিয়েছিল 'দিনবদলের সনদ'। স্লোগানটি অবশ্য ধার করা। আওয়ামী লীগের অনেক আগেই বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানি, বাংলালিংক এই দিনবদলের স্লোগান দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করে প্রচার চালাচ্ছিল। বাংলালিংকের বিজ্ঞাপনের সেই ভাষা আজও অবিকৃত রয়েছে। আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা বাংলালিংকের বিজ্ঞাপন দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কি না, সে তথ্য আমার জানা নেই। তবে দলটির দিনবদল ও ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রচার যে সেই সময় আমাদের তরুণ ভোটারদের যথেষ্ট আকর্ষণ করতে পেরেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জনগণের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, মহাজোট সরকারের শাসনের চার বছরের মাথায় চাকচিক্যময় উভয় কথাই ঠাট্টা-তামাশা ও বিদ্রূপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক-এগারোর সরকারের সময় এভাবেই 'সংস্কার' শব্দটিকে পচানো হয়েছিল। গত পৌনে চার বছরে দেশ ও জনগণের দিনবদল কতখানি হয়েছে, তার হিসাব বোধহয় ভোটাররা ভালোমতোই করতে শুরু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভীতির পেছনে জনগণের এই হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটিই কাজ করছে বলে আমার ধারণা। থাকগে, আজ আর দেশের রাজনীতি নিয়ে লেখার বিশেষ একটা ইচ্ছে নেই। গত ক'দিনে সাধারণ জনগণের অবস্থা জানার সুযোগ হয়েছে। চারপাশের সেই পরিচিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিনবদল কেমন হয়েছে, তারই খণ্ডচিত্র আজকের মন্তব্য-প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তিনটি পরিবারের বেঁচে থাকার সংগ্রামের গল্প বলে তারপর অর্থনীতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক আলোচনায় যাব।

* শেয়ারবাজারে সর্বস্ব হারানো এক অচেনা তরুণ হঠাৎ করেই গত সপ্তাহে পত্রিকা অফিসে এসে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলো। অনুমতি পেয়ে যে ঘরে ঢুকল, তার দিকে তাকিয়েই জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত এক মধ্যবিত্ত তরুণকে দেখতে পেলাম। গালে কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি, চোখে চশমা, গায়ের রঙ আমার মতোই কৃষ্ণবর্ণ। মায়াময় মুখ দেখে আন্দাজ করলাম, বয়স তিরিশের

www.pathagar.com

কাছাকাছি। ভূমিকা না করেই বলল, কোনো উপকার হবে না জেনেও শুধু মনের কথাগুলো বলে হালকা হওয়ার জন্য আপনার অফিসে এসেছি। ছেলেটির সোজাসাপটা কথা শুনে আমার নিজের ওই বয়সের কথা মনে পড়ে গেল। পরের আধঘণ্টা ধরে ওর কথা শুনলাম। তিন ভাইয়ের মধ্যে তরুণটি মেজো। বৃদ্ধ বাবা জীবিত, মাও আছেন। বিয়ে করেছে দুই বছর আগে, তবে এখনও কোনো সন্তান হয়নি। বড় ভাই বিদেশে কর্মরত, আর ছোট ভাই কলেজে পড়ে।

২০০৯ সালে সরকার ঘনিষ্ঠ লোকজনের নানারকম কারসাজিতে শেয়ারের দাম যখন প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে সেই সময় নিজের সামান্য পুঁজি এবং বিদেশ থেকে বড় ভাইয়ের পাঠানো টাকা নিয়ে শেয়ারবাজারে ঢুকেছিল। এর পরের কাহিনী আন্দাজ করতে আমার অসুবিধে হয়নি। ক্রমান্বয়ে পুঁজি শেষ হয়েছে, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোতে দেনার পরিমাণ বেড়েছে। একসময় ঢাকায় বাড়িভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে না পেরে স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়েছে। ছেলেটির ঠাঁই হয়েছে মুগদাপাড়ার এক মেসে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সে এখনও যাতায়াত করে পুঁজির কিছু অংশ অন্তত ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ আশায়। রিকশা চড়ার বিলাসিতা ত্যাগ করেছে, বাসের ভাড়াও সবসময় জোগাড় হয় না। তখন হাঁটা ছাড়া উপায় থাকে না। মেসের টাকাও বাকি পড়তে শুরু করেছে।

এত হতাশার মাঝে আত্মহত্যার কথাও যে মাথায় আসেনি, তা নয়। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসা আর মায়ের মমতা সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল। লুটেরাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অপরাধে গ্রেফতার হয়ে সাহারা খাতুনের পুলিশের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর এখন তো প্রতিবাদ জানানোরও কোনো উপায় নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের দাঁড়াতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। শেয়ারবাজার থেকে কারসাজির মাধ্যমে টাকা লুটে যারা সম্পদের পাহাড় গড়েছে, সরকার তাদের কিছু না বললেও প্রতিবাদকারীদের ছবি সিসি ক্যামেরায় তুলে রাখা হচ্ছে। প্রতারণার কাহিনী বর্ণনার সময় ছেলেটির চোখে কখনও অশ্রু, কখনও আগুন দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার কাছে সর্বস্ব হারানো তরুণটির শেষ প্রশ্ন ছিল, সরকার পরিবর্তন হলে আমরা পুঁজি ফেরত পাব তো? মনটা বড় খারাপ করে দিয়ে তরুণটি বিদায় নিল। রোজার দিন বলে ছেলেটিকে এক কাপ চাও খাওয়াতে পারলাম না।

* আমার খালা সাভারে থাকেন। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ চাকরি করতেন। এখন অবসর জীবনযাপন করলেও পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রক্ষা করেন। সেই সহকর্মীদের মধ্যে একজন আবার তার প্রতিবেশী। ভদ্রলোকের চারটি বিবাহযোগ্য কন্যা এবং অসুস্থ স্ত্রী কিডনি রোগে শয্যাশায়ী। তিনি যে বেতন পান, তাতে ছয়জনের সংসার চালানোই মুশকিল। এদিকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত ডায়ালিসিস করাতে হয়। সেই ব্যয় সবসময় বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অতিরিক্ত খারাপ হয়ে পড়লেই কেবল তাকে ঢাকায় এনে ডায়ালিসিস করানো হয়। নিয়মিত চিকিৎসার অভাবে হয়তো ভদ্রমহিলা আরও দ্রুত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু, অসহায় স্বামীর কোনো উপায় নেই। ভদ্রলোকেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। একদিন আমার খালা ভদ্রলোকের চোখে পড়ার মতো শরীরের ওজন কমার ব্যাপারে উদ্বেগ জানালে তিনি বললেন, কি করবো আপা, দিনের পর দিন কোনো প্রোটিন জোটে না, দুর্মূল্যের বাজারে ১০ টাকা দিয়ে একটা ডিম কিনে যে খাব, তারও তো উপায় নেই। দুধ তো কেবল স্বপ্নেই জোটে, শাক-পাতা খেয়ে আর কতটা ভালো থাকা যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার সরকারের মন্ত্রীদের ভুয়া প্রবৃদ্ধির গালগল্পে আর চালানো যাচ্ছে না।

* ক'দিন আগে আমার এক ভাগ্নি তার স্বামীকে নিয়ে দেখা করতে বাসায় এসেছিল। একান্নবর্তী পরিবার হলেও ওদের সংসার খুব একটা বড় নয়। ভাগ্নির বিধবা শাশুড়ি একসময় ব্যাংকে চাকরি করতেন, বর্তমানে অবসরে। ভাগ্নিজামাই ছেলেটিও একটি সরকারি ব্যাংকে চাকরি করে। আমার ভাগ্নির দেবর সম্প্রতি বিয়ে করেছে। ছেলেটি বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে। সব মিলে পাঁচজনের সংসার। ২০০৭ পর্যন্ত সংসারে প্রাচুর্য না থাকলেও অনটন ছিল না। মায়ের পেনশনের টাকা আর দুই ছেলের রোজগার দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদও পূরণ হয়ে যেত। গত পাঁচ বছরে বড় ছেলের ব্যাংকের চাকরিতে বেতন যতটুকু বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তার কয়েকগুণ। দেশে সার্বিক ব্যবসায় মন্দার কারণে ছোট ছেলের সাপ্লাই ব্যবসা থেকে আয় অনেক কমে গেছে। মাত্র পাঁচজনের সংসার চালাতেই এখন হিমশিম অবস্থা।

ভাগ্নিজামাই ছেলেটি বলল, বাজারে গেলে ৫০০ টাকা নিমেষে শেষ হয়ে যায়। অথচ আগে ৫০০ টাকায় পুরো বাজার হয়ে যেত। রোজার মাসে ইফতারির জন্য খাবার কেনাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এক হালি কলার দাম ৫০ টাকা। কিনব কী করে? উপায় না দেখে কিছুদিন হলো আমার ভাগ্নি বাসার কাছেই একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছে। যদি তাতে সংসারের কিছুটা সাশ্রয় হয়। এত কষ্টের মধ্যেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের লৌকিকতা ছাড়তে পারেনি। আমার, মায়ের এবং আমার স্ত্রীর জন্য ঈদের উপহার কিনে নিয়ে এসেছে। এই দুর্দিনে অপচয়ের

www.pathagar.com

জন্য দু'জনই হাসিমুখে আমার বকা শুনে বিদায় নিল। আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত এই মধ্যবিত্তের জীবন।

আর ক'দিন পরেই মুসলমানদের সবচেয়ে আনন্দের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। যে তিনটি মধ্যবিত্ত সংসারের কথা লিখলাম, তাদের কাছে সেই ঈদ আনন্দের চেয়ে বেশি না পাওয়ার বেদনার। ধারণা করছি, এ দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ পরিবারের চিত্র এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মহাজোট সরকার এ পর্যন্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য যে প্রকৃতির দিনবদল নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে জনগণের প্রত্যাশার কোনো মিল নেই। অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও সম্পদের অসম বণ্টন রয়েছে। কিন্তু বিগত চার বছরে যেভাবে শাসকগোষ্ঠীর কিছু পরিবারের কাছে রাষ্ট্রের সিংহভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে, বিশ্বে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। লোকমুখে শুনেছি, সে রকম একটি পরিবারের বাসায় বিশেষ ধরনের পর্দা লাগানোর জন্য সিঙ্গাপুর থেকে বিদেশি কারিগর উড়িয়ে আনা হয়। তাদের রাখা হয় ঢাকার বিলাসবহুল ওয়েস্টিন হোটেলে। শেয়ারবাজার লুণ্ঠন, কুইক রেন্টাল ও পদ্মা সেতু মার্কা প্রকল্প থেকে এরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এদের জন্য দিনবদল হয়েছে বৈকি! এই গোষ্ঠী আগে বিদেশে বাড়ি, গাড়ি কিনে রাখত, এখন নাকি ব্যক্তিগত বিমান কেনে।

অন্যদিকে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা দেশের সার্বিক অবস্থায় চোখে অন্ধকার দেখছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় চাকরির বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে। যারা চাকরি করছেন মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের নীট আয় দিন দিন কমছে। প্রলোভনের ফাঁদ পেতে শেয়ারবাজারের লুটেরারা অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের সঞ্চয়ই লোপাট করে দিয়েছে। অথচ সংসারের ব্যয় বাড়ছে। কুইক রেন্টালের ভর্তুকির ক্ষুধা মেটাতে মহাজোট সরকার এ যাবত পাঁচ দফা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। ঈদের পর বিদ্যুতের দামের ষষ্ঠ দফা বৃদ্ধির ঘোষণা আসতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির সব বোঝা অসহায় জনগণের ঘাড়ে তুলে দিতে দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাসীন মহল কোনোরকম লজ্জাবোধ করছে না।

আওয়ামী লীগের এবারের শাসনামলে ৩ দফায় জ্বালানি তেলের দাম এবং ৪ দফায় পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশার বর্তমান ভাড়া মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে। তাই আগে যারা সিএনজিতে চড়তেন, তারা এখন বাসে উঠছেন। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। খাদ্য

গুমরাজ্যে প্রত্যাবর্তন ০৭

www.pathagar.com

বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে আরও বেশি। এই জাতীয় পণ্য নিয়ে সচরাচর আলোচনা কম হলেও মধ্যবিত্তের বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় এগুলো কিনতেই। প্রতিটি পরিবারেই সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, শিক্ষা উপকরণ এবং এই ধরনের অন্যান্য পণ্যের প্রয়োজন হয়। আমি দীর্ঘদিন যেহেতু বাজারে যাই না, তাই এসব পণ্যের দাম সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। এই লেখার রসদের জন্য অর্থনীতি বিটের সাংবাদিকদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ওরাই আমাকে বর্তমান বাজারমূল্য জোগাড় করে দিয়েছে।

২০০৯ সালে ৫০ গ্রামের তিব্বত সাবানের দাম ছিল ১৫ টাকা, যা এখন ২৬ টাকা। ক'দিন আগের ৬০ টাকার জনসন পাউডারের বর্তমান মূল্য ৯৫ টাকা। টুথপেস্ট, নারকেল তেল, ক্রিম ইত্যাদির দামও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। সরকারপ্রধান হয়তো দাবি করতে পারেন, এগুলো সব উচ্চবিত্তের ব্যবহার্য পণ্য। অবশ্য কোনো উচ্চবিত্ত তিব্বত সাবান ব্যবহার করেন বলে আমার জানা নেই। তারা সব বিদেশি ব্র্যান্ডের সাবানের গ্রাহক। দাম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সেইসব বিত্তবানের নেই। যাই হোক, সব থেকে ভয়াবহ অবস্থা শিশুখাদ্য এবং ওষুধের বাজারে। পরিবারে শিশু থাকলে শিশুখাদ্য কিনতেই হয়। আর অসুখ হলে ওষুধ ছাড়া চলে না। গত ছয় মাসে উভয় পণ্যশ্রেণীতেই মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় শতভাগ। মূল্যবৃদ্ধির এই প্রতিযোগিতায় বাড়িওয়ালারাই-বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? মধ্যবিত্তের তো আর নিজের বাড়ি থাকে না। অতএব ফি-বছর বাড়িভাড়া লাফিয়ে বাড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সবাই চালের দাম স্থিতিশীল থাকায় সাফল্যের ডংকা বাজাচ্ছেন। ২০০৮ সাল থেকেই প্রকৃতি অনুকূল থাকায় আল্লাহ্‌র রহমতে দেশে প্রতি বছর ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ফলে মধ্যবিত্তের চাল নাজিরশাইল এবং মিনিকেট তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই আছে। কিন্তু, এই সময়ের মধ্যে বাকি সব খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির মতো রাষ্ট্রীয় খাতে প্রতিটি সেবার কয়েকগুণ দাম বাড়ানো। সবমিলে মধ্যবিত্তের যৎসামান্য সঞ্চয়ে হাত পড়েছে। যাদের সঞ্চয় এর মধ্যেই শেয়ারবাজারে ডুবে গেছে, তাদের অবশ্য সঞ্চয় ভেঙে বেঁচে থাকার সুযোগও নেই।

আমাদের অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেট ঘোষণার সময় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে বইটি প্রকাশ করেছেন, সেখানেই জাতীয় সঞ্চয় ভেঙে খাওয়ার প্রমাণ মিলবে। উন্নয়নশীল দেশে যেখানে জিডিপির হিসাবে প্রতি বছর জাতীয় সঞ্চয় কিছুটা হলেও বাড়া উচিত, সেখানে বর্তমান সরকারের আমলে সঞ্চয়

www.pathagar.com

কমেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সচরাচর তাদের যৎসামান্য সঞ্চয় বিভিন্ন মেয়াদি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে থাকে। গত তিন বছরে সেই সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার এক-চতুর্থাংশও পূরণ হয়নি। মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ই নেই, তো সঞ্চয়পত্র কিনবে কোথা থেকে?

মধ্যবিত্তের জীবনযুদ্ধের সঙ্গে আমার আজন্ম পরিচয়। প্রলোভনকে পরাজিত করে সততার সঙ্গে বেঁচে থাকতে হলে এই শ্রেণীকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়। গণমুখী শাসকশ্রেণীর কর্তব্য দেশে এমন এক পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মেধার বিকাশ সহজতর হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মহাজোটের এই মেয়াদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেবল যে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে তাই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনের শাসনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির ফলে তাদের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতার সব পথও রুদ্ধ হয়েছে। সর্বত্র দলবাজি কীভাবে মেধাকে গ্রাস করছে, সেই চিত্র দেখার জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেই চলবে। শিক্ষক নিয়োগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে টপকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী হওয়ার সুবাদে দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তরা অহরহ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সৌভাগ্যবশত ফাঁস না হলে লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখায় যাও-বা কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় থাকে, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার নামে সরাসরি ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ দিতে হয়। ছাত্রলীগ করলে ভাইভাতে পাস করা যাবে। নইলে পত্রপাঠ বিদায়।

অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসনের ছদ্মাবরণে ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলবাজির অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। সেসব স্থানে মন্ত্রী, এমপিদের সুপারিশ ছাড়া চাকরি পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। সেই সুপারিশ জোগাড় করতে ছাত্রলীগ করার সার্টিফিকেট প্রদানের অতিরিক্ত নগদ অর্থও দিতে হয়। সুতরাং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভিসিদের দলবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত লেখাপড়া করে। তাদের শিক্ষাজীবনও এখন ব্যাহত হচ্ছে।

বুয়েটের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে সেখানেও সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হলে তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বৃদ্ধির চাপ অভিভাবকদেরই বহন করতে হবে। অর্থাৎ সব মিলে মধ্যবিত্তের জীবন বর্তমান সরকারের আমলে ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আমার

www.pathagar.com

ধারণা, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ২০০৮ সালের নির্বাচনে দিনবদলের আশায় আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়েছিল। শেয়ারবাজার ধ্বংস, চাকরির বাজার দলীয়করণ, লেখাপড়ার পরিবেশ বিনষ্ট, আইনের শাসনের বিনাশ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে যে প্রকৃতির দিনবদল উপহার দিয়েছে, তাতে সেই ভোটারদের আশাভঙ্গের বেদনার কোনো সীমা নেই বলেই ধারণা করছি।

প্রশাসনে এত অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে একটি রাষ্ট্র অধিককাল টিকে থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে যারা সরকারে আসার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের এই ঘুণে ধরা প্রশাসনের প্রকৃত, গণমুখী সংস্কারের কৌশল এখনই নির্ধারণ করতে হবে। একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত হওয়া বিপুল অবৈধ সম্পদ রাষ্ট্রের কোষাগারে ফিরিয়ে নিয়ে সম্পদের বণ্টনের (Distribution of wealth) অসহনীয় অসাম্য দূর করার অন্তত একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে যেভাবে হাওয়াই প্রতিশ্রুতির বন্যা ছুটিয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি এবার আর সম্ভব হবে না বলেই আমি মনে করি। বর্তমান সরকারের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার পর জনগণের শেষ ভরসা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আগামী সরকার। তারা শিক্ষা গ্রহণ না করলে বাংলাদেশ অনিবার্যভাবেই অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হবে। আশা করি, জনগণের মনের ভাষা এবার অন্তত ভবিষ্যৎ সরকারের নীতিনির্ধারকরা বুঝবেন।

৮ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : প্রচারণা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের দরিদ্র আলেমরা বড় বিপদের মধ্যে আছেন। মহাজোটের আমলে জঙ্গির তকমা কখন তাদের কার কপালে জুটে যায়, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিয়মিত বিরতিতে লম্বা দাড়ি মুখে, টুপি মাথায় দেয়া অচেনা সব মাদরাসার অসহায় শিক্ষকদের টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে প্যারেড করানো র‍্যাব এবং ডিবি পুলিশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। চেহারা দেখলে অনুকম্পা হয় এমন ব্যক্তিরা নাকি ভয়ঙ্কর সব আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের বাংলাদেশের প্রধান! একই নামের সংগঠনের একাধিক তথাকথিত প্রধানকে মিডিয়ায় হাজির করতেও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনো ধরনের সঙ্কোচ বোধ করে না।

সেসব সংগঠনের নাম অবশ্য বেশ জমকালোই হয়ে থাকে। জেএমবি, হরকাতুল জেহাদ–এগুলো এখন পুরনো হয়ে গেছে। হালে শুরু হয়েছে লস্কর-ই-তৈয়বা, জৈশ-ই-মোহাম্মদ ইত্যাদি জাতীয় পাকিস্তান ও ভারতের ইসলামী জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশে আমদানির পালা। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এসব তথাকথিত জঙ্গিকে ধরার পর তাদের আর কোনো পাত্তা থাকে না। মাথায় হেলমেট, বুকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরানো মানুষগুলোকে রিমান্ডে নেয়া পর্যন্ত পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়। তারপর আর হদিস নেই। এদের কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া গেল, এদেশে তাদের সঙ্গী-সাথী কারা, নাকি ১৪ ও ১৮ দলীয় জোটভুক্ত অধিকাংশ দলের মতো শুধু নেতা আছে কর্মী নেই–এসব বিষয় মিডিয়াকে জানাতে গোয়েন্দা কর্তাদের কোনোরকম উৎসাহ পরবর্তী সময়ে বিশেষ একটা দেখা যায় না।

এই অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে প্রচারণা সার্কাস চালানোর পর আর জীবিত রাখা হয় কি-না, তাও আমরা জানতে পারি না। আর এরা যদি প্রকৃতই ওইসব কথিত জঙ্গি গোষ্ঠীর বাংলাদেশীয় প্রধান হয়ে থাকে, তাহলে উপমহাদেশের এসব কাগুজে জঙ্গি দিয়ে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো যাবে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিতে পারেন।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতারের পরদিন সিএমএম আদালতে নেয়ার সময় আমাকেও জঙ্গিদের জন্য নির্ধারিত হেলমেট আর জ্যাকেট পরানোর জন্য পুলিশের লোকজন যথেষ্ট জোরাজুরি করেছিল। আওয়ামী বরকন্দাজদের সেদিনের চেষ্টা সফল হলে দেশবাসী এক ভয়ঙ্কর জঙ্গি মাহমুদুর রহমানকে টেলিভিশনের পর্দায় এবং পত্রিকার পাতায় দেখতে পেতেন। আমি বরাবরই একগুঁয়ে মানুষ। পুলিশ কর্তাদের সোজা বলে দিয়েছিলাম, ওইসব পরাতে হলে আগে প্রিজন ভ্যানের ভেতরেই আমাকে গুলি করে মারতে হবে। অনেক হুমকি দেয়ার পরও কোনো কাজ না হওয়ায় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন গোপালি পুলিশ শেষতক পিছিয়ে গিয়েছিল।

তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিদের বিষয়ে আরও এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছি। আমার ১৪ দিনের রিমান্ড জীবনের একদিন উত্তরার র‍্যাব-১ হেডকোয়ার্টারের টিএফআই সেলে কাটাতে হয়েছিল। সেখানে অন্ধকূপের মতো সেলে বেশ ক'জন দাড়িওয়ালা মধ্যবয়সী বন্দীকে দেখেছিলাম। তাদের হাতকড়া পরিয়ে এক-একটি সেলে জন্তু-জানোয়ারের মতো আটকে রাখা হয়েছিল। আমিও একই রকমভাবে বন্দি অবস্থায় আমার সেল থেকে সেসব অসহায় মানুষের অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শুনেই জিজ্ঞাসাবাদের সময়টুকু ছাড়া পুরোটা দিন পার করেছিলাম। টিএফআই সেলে নির্যাতনের যা ব্যবস্থা আছে, সেগুলো প্রয়োগের পর লস্কর-ই-তৈয়বার বাংলাদেশী প্রধান তো নস্যি, যে কোনো ব্যক্তি জান বাঁচানো ফরজ বিবেচনা করে নিজের বিরুদ্ধে 'আল-কায়দা নেতা ওসামা-বিন-লাদেনকে বোমা বানানো শেখানোর মাস্টার' এই অভিযোগও মেনে নেবে।

আমার বিরুদ্ধে ৫৫টি মামলার মধ্যে কথিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের সঙ্গে সম্পৃক্ততার একটি মামলাও রয়েছে। সংগঠনটির সঙ্গে আমি কীভাবে সম্পৃক্ত, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা না থাকলেও রিমান্ড চলাকালে ডিবির লোকজন অভিযোগ করেছিল, হিযবুত তাহ্‌রিরের প্রচারপত্রের ভাষার সঙ্গে আমার লেখা বইপত্রের নাকি তারা মিল খুঁজে পেয়েছে। তাছাড়া সংগঠনটির এক সময়কার প্রধান সমন্বয়কারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদের অধ্যাপক মহিউদ্দিন যেহেতু আইবিএ'র এমবিএ এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকটির বছর দশেক আগে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একই ডিগ্রি নিয়েছি, অতএব, দুয়ে-দুয়ে চার। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে জঙ্গি উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, ডিবির তরুণ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য পেয়ে সেদিন আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম।

এবারের রমজান মাসেও সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী তাদের জঙ্গি ধরার কর্মকাণ্ডে কোনোরকম অলসতা দেখায়নি। ঢাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে

www.pathagar.com

ইফতারের সময় ২৫ জন তরুণকে হিযবুত তাহ্‌রিরের কর্মী দাবি করে পাকড়াও করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমাদের পুত্রসম ছেলেগুলোর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে 'ভয়ঙ্কর' সব লিফলেট উদ্ধার করেছে মহাজোট সরকারের করিৎকর্মা পুলিশ বাহিনী। রোজার দিনে ওরা ইফতার পেয়েছিল কিনা জানি না, তবে হলফ করে বলতে পারি, পুলিশের লাঠি তাদের সর্বাঙ্গে নির্বিচারে পড়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অবধারিত পরিণতিতে এদেশের তরুণরা যখন নৈতিক অবক্ষয়ে অধঃপতিত হচ্ছে, তখন তাদেরই একটা অংশ যদি ইসলাম ধর্ম নিয়ে চর্চা করে তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধপ্রবণ সমাজের উপকার হওয়ারই কথা। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে বাঙালিয়ানা জাহিরের নামে তরুণ প্রজন্মের কলকাতার হিন্দু বাবু সংস্কৃতি চর্চায় কোনোরকম বাধা দেয়া না হলেও বিস্ময়করভাবে তাদের ইসলাম চর্চা ভয়ঙ্কর অপরাধরূপে পরিগণিত হচ্ছে। সরকারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, হিন্দি ছবি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের পুত্র-কন্যারা মাদক সেবন ও অন্যান্য অপকর্মে অভ্যস্ত হলে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু ধর্মালোচনা তাও আবার ইসলাম নৈব নৈব চ।

ঈদের কয়েকদিন আগে ঢাকার ফকিরাপুল এলাকা থেকে কক্সবাজারের প্রত্যন্ত এলাকার এক মাদরাসা শিক্ষককে গ্রেফতার করে তাকে জৈশ-ই-মোহাম্মদের বাংলাদেশী প্রধান বানানো হয়েছে। মাওলানা মো. ইউনুস ছাড়াও এর আগে আরও কয়েকজনকে একই জৈশ-ই-মোহাম্মদের প্রধান দাবি করে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। কৌতুকের বিষয় হলো, ডিবির দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনটির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সর্বশেষ প্রধান কোন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, সেটাও সঠিকভাবে গোয়েন্দা কর্তারা ঘটা করে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে জানাতে পারেননি। মাওলানা মো. ইউনুস নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, কী অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি পাকিস্তানের কোনো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্তও নন। ডিবির নাটকীয় জঙ্গি আবিষ্কারের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল, জৈশ-ই-মোহাম্মদের কথিত প্রধান মো. ইউনুস কক্সবাজারের রামু উপজেলার গর্জনিয়া মসজিদের খতিব। তাকে ডিবি পুলিশের পরিচয় প্রদানকারী ১৬ জন পুলিশের একটি দল ৩ আগস্ট গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ১২ দিন আলেম মানুষটিকে অজানা স্থানে বন্দী রাখার পর ঢাকার ডিবি পুলিশের ডিসি সংবাদ সম্মেলন ডেকে নাটকীয়ভাবে তাকে একজন ভয়ঙ্কর জঙ্গি নেতারূপে পরিচয় দিয়ে ফকিরাপুল থেকে ধরার দাবি করেছেন। নির্লজ্জ মিথ্যাচারেরও একটা সীমা থাকা উচিত।

আমার দেশ পত্রিকার বান্দরবান প্রতিনিধি রামুতে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও জেনেছেন যে, মাওলানা মো. ইউনুস আওয়ামী লীগেরই অঙ্গসংগঠন ওলামা

www.pathagar.com

লীগের রামু শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেখানকার ওলামা লীগের সভাপতি সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ ফোরকান জানিয়েছেন, মাওলানা ইউনুস এলাকায় একজন সৎ লোক হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক হিমছড়ির প্রথম পাতায় ৭ আগস্ট গর্জনিয়া মসজিদের খতিবকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদও ছাপা হয়েছে। তবে মাওলানা ইউনুসকে ভাগ্যবান বলতে হবে যে, ১২ দিন অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখার পর তাকে মিডিয়ার সামনে হাজির করা হয়েছে। তিনি অন্তত প্রাণে বেঁচে গেছেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশ তাকে ইলিয়াস আলীর মতো গুম করে ফেললেই বা আমরা কী করতে পারতাম? বর্তমান সরকারের আমলে গুমের অগণিত মিছিলে আরও একজন হতভাগা যুক্ত হতো মাত্র। হয়তো আওয়ামী ওলামা লীগের সঙ্গে সম্পর্কই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আগের মেয়াদেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিত্বের উত্থান নিয়ে দেশে-বিদেশে এন্তার প্রচারণা চালিয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুস্তিকা ছাপিয়ে বাংলাদেশকে রীতিমত জঙ্গি রাষ্ট্রের খেতাব দেয়া হয়েছিল। প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম চলমান একটি গ্রাম পরিদর্শনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করেছিলেন। শেষপর্যন্ত বারিধারার মার্কিন দূতাবাসে নকল গ্রামের আবহ তৈরি করে সেখানেই আদর্শ গ্রাম দেখার সাধ মেটাতে বাধ্য হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও প্রটোকল ভেঙে দূতাবাসে গিয়ে বিদেশি অতিথিকে সঙ্গ দিতে হয়েছিল। জঙ্গিবাদের গল্প প্রচার করে বাংলাদেশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়েও অবশ্য শেখ হাসিনার শেষরক্ষা হয়নি। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জঙ্গি কার্ড ব্যবহার সত্ত্বেও তার দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলেই এদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল। উদীচীর অনুষ্ঠানে, রমনার বটমূলে, সিপিবির জনসভায় এবং নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী গডফাদার শামীম ওসমানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১–এই পাঁচ বছরের মধ্যেই ঘটেছিল। এমনকি কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সফরকালে কথিত ৯৬ কেজি বোমা হামলার ষড়যন্ত্রের সময়টাও ছিল ১৯৯৯ সাল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী ঘটনার একটিরও রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়নি। জনমনে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে আদৌ উৎসাহী ছিল না। পরবর্তীকালে বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও মেয়াদের প্রথমদিকে জঙ্গিবাদের উৎস খুঁজে বের করার

www.pathagar.com

ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। বরঞ্চ, উত্তরবঙ্গে বাংলাভাইয়ের উত্থান এবং জেএমবি'র অব্যাহত অপতৎপরতা তৎকালীন জোট সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। জেএমবি'র প্রধান শায়খ আবদুর রহমান আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও চারদলীয় জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে রহস্যজনকভাবে কালক্ষেপণ করে। জামায়াতে ইসলামীর আমির এবং সে সময়কার শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংসদে বক্তৃতাকালে বাংলাভাইকে মিডিয়ার সৃষ্টি দাবি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রচারণার অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণে আওয়ামী মহিলা লীগের সভানেত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতির স্ত্রী আইভী রহমানসহ তৎকালীন বিরোধী দলের ১৯ জন নেতাকর্মীর নিহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনার তদন্তেও বিএনপি সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জজ মিয়া নামের এক রহস্যময় চরিত্র সৃষ্টি করে অনেক নাটকের অবতারণা করলেও শেষপর্যন্ত সরকারের জন্য সেটাও বুমেরাংয়ে পর্যবসিত হয়। সরকারের অদক্ষতার সুযোগ নিয়ে ২০০৪ সালের নভেম্বরে আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রে মাসিক তিরিশ হাজার মার্কিন ডলার নির্ধারিত (Fixed) পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ দেয়ার বিনিময়ে অ্যালকালদে অ্যান্ড ফে (Alcalde & Fay) নামের এক লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করে। অন্যান্য কার্যতালিকার সঙ্গে তারা কংগ্রেস, মিডিয়া এবং মার্কিনি জনগণের মধ্যে বিএনপি সরকার আল-কায়দার প্রতি সহানুভূতিশীল ইসলামী জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশে সমর্থন দিচ্ছে–এ জাতীয় প্রচারণা চালানোরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। একই সময়ে বাংলাদেশের আওয়ামীপন্থী মিডিয়াতেও এদেশে জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব বিষয়ক ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের প্রতিটি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের চমকপ্রদ ঘটনা অবশেষে সরকারকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হয়। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে বেশ দ্রুততার সঙ্গে বাংলাভাই, শায়খ আবদুর রহমান এবং জেএমবি'র অন্যান্য সদস্য একে একে গ্রেফতার হয়। দ্রুত বিচার আইনে এদের সবাইকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়ে চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়। এক-এগারো পরবর্তী সামরিক সরকার বিএনপি সরকারের আমলের দেয়া সেই দণ্ড অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করে।

বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে গড়ে ওঠা জঙ্গি সংগঠন জেএমবি'র নেতাদের গ্রেফতার এবং তাদের বিচারকার্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বেগম

www.pathagar.com

খালেদা জিয়ার সরকারের হলেও সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে আজ পর্যন্ত উল্টো বিএনপিকেই জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অব্যাহত অপপ্রচারের শিকার হতে হচ্ছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করেই ২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। বাংলাভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানকে ফাঁসি দেয়া হলেও জেএমবি প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর আজ পর্যন্ত অজানা থেকে গেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে অনেকগুলো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কেন কোনো ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্ত অথবা কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার করেনি?

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট একই সময়ে দেশের প্রতিটি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো কারিগরি, আর্থিক এবং লজিস্টিক সক্ষমতা জেএমবি'র মতো একটি ক্ষুদ্র, মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষে অর্জন করা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? নাকি দেশীয় অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা জেএমবি'র নাম ব্যবহার করে বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিখুঁত নিশানায় দেশব্যাপী এই অপারেশন চালিয়েছে? এবারের মেয়াদে ক্ষমতায় এসেও আওয়ামী লীগ সরকার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা এবং ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলাকে ব্যবহার করে সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও বিরোধী দলের নেতাদের ফাঁসানোর নানারকম উদ্যোগ নিলেও তাদের আগের আমলের আলোচিত সন্ত্রাসী ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কোনো তৎপরতা দেখাচ্ছে না কেন? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে বিএনপি আমলের অপর একটি ধর্মীয় আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

খতমে নবুয়ত নামে একটি সংগঠন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সে সময় কিছুদিন পরপর এই সংগঠনের ব্যানারে বিশাল সব জঙ্গি মিছিল প্রধানত তেজগাঁও শিল্প এলাকা, নাখালপাড়া এবং বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করে আহমদীয়াদের মসজিদের দিকে ধাবিত হতো। ঢাকার বাইরের কয়েকটি জেলাতেও তখন আহমদীয়ারা হয়রানির শিকার হয়েছে। বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খতমে নবুয়তের মিছিলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করলেও অজানা কারণে সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে কখনোই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাদের অর্থায়নের উৎসের বিষয়েও তেমনভাবে খোঁজখবর নেয়া হয়নি বলেই আমার ধারণা। ফলে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আহমদীয়া

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের সমর্থকবৃন্দ জোট সরকারের বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে প্রচার চালাতে সক্ষম হয় যে, এদেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে নেই।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কর্মকর্তারা তখন বাংলাদেশ সফরে এলে অবধারিতভাবে আহমদীয়াদের মসজিদসহ বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শনে যেতেন। মার্কিনিদের তরফ থেকে এই আচরণ তৎকালীন সরকারের প্রতি এক প্রকার অসন্তুষ্টির বার্তা ছিল বলেই আমার ধারণা। দুর্ভাগ্যবশত চারদলীয় জোট সরকারের নীতিনির্ধারকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সতর্ক বার্তা একেবারেই বুঝতে পারেননি অথবা বুঝলেও আমলে নেননি। ক্ষমতায় থাকলে একপ্রকার দম্ভ বোধহয় শাসকদের পেয়ে বসে। বর্তমানেও প্রফেসর ইউনূসের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্বেগকেও একইভাবে শেখ হাসিনা অব্যাহতভাবে অবজ্ঞা করে চলেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আহমদীয়াবিরোধী সেসব কট্টরপন্থী একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেছেন। আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিকরা তাদের খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করলে খতমে নবুয়তের কয়েকজন নেতা রীতিমত তেড়ে এসেছেন। তাদের কথা হলো, এসব আন্দোলন একান্তই তাদের কৌশলের বিষয়। সময়-সুযোগমত তারা মাঠে নামবেন। অর্থাৎ এই বিষয়টি ধর্মীয় নয়, নিতান্তই রাজনৈতিক। ধর্মীয় আন্দোলনের নামে বাংলাদেশের জনগণের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিনষ্টকারী এই অপকর্মের সঙ্গে বিদেশি সংযোগ থাকারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিএনপির নীতিনির্ধারকরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই খেলাটি ক্ষমতায় থাকতে সম্ভবত ধরতে পারেননি।

নব্বইয়ের দশকে আমাদের আলেম সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ অস্থির আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জঙ্গিবাদের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন বলেই আমি মনে করি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে যেসব বিদেশি নাগরিক অংশগ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশীও ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই বাংলাদেশীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় অন্তরে জঙ্গিবাদের বীজ হয়তো নিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ প্রধানত শান্তিপ্রিয় হওয়ার কারণে সেই জঙ্গিবাদ এখানে বিকশিত হতে না পারলেও কিছুসংখ্যক স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষ সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে এটিকেই সঠিক পন্থা ভেবে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নবিরোধী গোষ্ঠী সেই ভুলের সুযোগ নিয়েছিল। সারাদেশে একই সময়ে প্রায় চারশ' বোমা বিস্ফোরণ সেই বিশেষ গোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া কয়েকজন গ্রাম্য মাওলানার পক্ষে

www.pathagar.com

ঘটানো যে সম্ভব ছিল না, সেটা আশা করি দেশের চিন্তাশীল নাগরিকরা উপলব্ধি করেন।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর মতো দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিতর্কিত ব্যক্তি আজ যখন প্রকাশ্যেই বলেন যে, ১৭ আগস্টের ওই ঘটনার কারণে বিএনপিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা উচিত, তখন ঘটনার সঙ্গে তাদের প্রভুদের সম্পৃক্ততা নিয়েও জনমনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। বাস্তবতা হলো–এদেশে জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় আওয়ামী লীগই রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে জঙ্গিবাদ তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার অন্যতম অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই প্রচারণার মাধ্যমে দিল্লির আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি ওয়াশিংটনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে মার্কিন প্রশাসনের একতরফা সমর্থন আদায় এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির মুখ বন্ধ থাকার পেছনে প্রধানত এই জঙ্গিবাদের গল্পই কাজে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনও আশা করছেন যে, আগামী জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে এলে জঙ্গিবাদের পুরনো কার্ড ব্যবহার করেই প্রফেসর ইউনূস ইস্যু, দুর্নীতির নজিরবিহীন ব্যাপকতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় অসন্তুষ্ট মার্কিন প্রশাসনকে শেষপর্যন্ত বাগে আনা সম্ভব হবে। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের সহায়তায় নির্বাচনের সময়কালীন নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে তার অধীনেই নির্বাচন করার মাধ্যমে আবারও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। রমজান মাসে ইফতারের সময় রোজাদার তরুণদের গ্রেফতার এবং রামুর একজন সাধারণ মাদরাসা শিক্ষককে জড়িয়ে জৈশ-ই-মোহাম্মদের নাটক সাজানো আওয়ামী লীগের সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ মাত্র।

সরকারের শেষ বছরে ডিবি পুলিশ এবং র‍্যাবের এ ধরনের জঙ্গিবিরোধী অপারেশনের সংখ্যা যে অনেক বাড়বে, সেটা হলফ করেই বলা যায়। নতুন করে জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উত্থাপনের ভয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির পক্ষেও চরমভাবে মানবাধিকার হরণকারী এসব কর্মকাণ্ডের কার্যকর প্রতিবাদ করা সম্ভব হবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কথা বলতে পারব না, তবে পৌনে চার বছরের অপশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে, এত হিসাব-নিকাশ সত্ত্বেও ক্ষমতাসীনদের পক্ষে মসনদ রক্ষা করা হয়তো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে শেষ চেষ্টা হিসেবে

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালে ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রতিষ্ঠার সময় শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে সংবিধান সংশোধন করে তার সরকারের মেয়াদ নির্বাচন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই বছর বৃদ্ধি করেছিলেন, তার কন্যাকেও সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। ১৯৭৫ সালে ভোট ছাড়াই দুই বছর মেয়াদ বাড়ানো গেলে ২০১৩ সালে পাঁচ বছর বৃদ্ধিতে আর সমস্যা কী? তৃতীয় বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র রক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেয়ে কথিত 'জঙ্গিবাদ' দমনই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই 'সহজ' কথাটি পাশ্চাত্যের নিও-কনদের (Neo-con) বোঝাতে ড. গওহর রিজভী, দীপু মনিদের তেমন কোনো সমস্যা নাও হতে পারে। সেই লক্ষ্য অর্জনেই জঙ্গিবাদের এত প্রচারণা চলছে।

অপরদিকে বাংলাদেশকে আর রাডারের বাইরে যেতে না দেয়ার ঘোষণা বাস্তবায়নে দিল্লি যে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখবে না, সেটাও এদেশে তাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট জেনারেল এরশাদের সাম্প্রতিক ভারত সফরের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস অথবা বিজেপি, আঞ্চলিক পরাশক্তির রাষ্ট্রক্ষমতায় যারাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ নীতিতে রাষ্ট্রটির কোনো পরিবর্তন আশা করা নির্বুদ্ধিতাই হবে। সুতরাং আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ যে বিপজ্জনকভাবে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে, তা হলফ করেই বলা যায়।

২৯ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

আইন সবার জন্য সমান নয়

আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অংশে প্রচুর সুবচন লেখা রয়েছে। দুঃখের কথা হলো, এই সুবচনগুলোর অধিকাংশই কাজির গরুর মতো কেবল কেতাবেই থাকে। এগুলো মান্য করার বিশেষ একটা গরজ রাষ্ট্রের নেই। সংবিধানের ২৭ এবং ৩১ নম্বর ধারা সেসব প্রজাতির সুবচনেরই উদাহরণ। ২৭ নম্বরে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

৩১ নম্বরে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের বিষয়ে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। এবার সাম্প্রতিক তিনটি আলোচিত ঘটনার উল্লেখপূর্বক ব্যক্তিভেদে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ এবং ৩১ ধারা প্রয়োগের রকমফের পাঠককে দেখানোর চেষ্টা করবো। ঘটনা তিনটি হলো :

(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা।

(২) সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাস ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা পুড়িয়ে ধ্বংস করা।

(৩) সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের সদস্য অথবা সমর্থকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আশপাশের এলাকায় গাড়ি ভাংচুর ও আগুন লাগানোর মহোৎসব।

প্রথম ঘটনা : বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস আলীকে সরকারি বাহিনী কর্তৃক গুমকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী আন্দোলনের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে একটি বাসে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ভাংচুর চালায় এবং আগুন দেয়। পুলিশের অভিযোগপত্র

www.pathagar.com

অনুযায়ী এর ফলে বাসটির সর্বমোট ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে সরকার বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৩৮ জন নেতার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করে। এই মামলায় সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এক মাসেরও অধিক সময় কারাগারে আটক রাখা হয়। শেষপর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি মিললেও তাদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে এখন মামলা চলছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যারা বাসটিতে ভাংচুর চালানোসহ আগুন দিয়েছে, তাদের কাউকেই আজ পর্যন্ত পুলিশ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি, গ্রেফতার তো দূরের কথা।

রাজধানীবাসী মাত্রই জানেন শেখ হাসিনার আমলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বাসস্থানের (গণভবন) নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের যে কোনো আমলের তুলনায় অনেক কঠোর। সেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল পরিচয়বিহীন লোক বাসে অগ্নিসংযোগ করলেও সাহারা খাতুনের করিৎকর্মা পুলিশ কিংবা র‍্যাব ঘটনার সময় কোনো বাধা দিতে সক্ষম হয়নি! মূল অপরাধীরাও অদ্যাবধি শনাক্ত হয়নি! কিন্তু হুকুমের আসামি হিসেবে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও সাবেক মুখ্য সচিব এম কে আনোয়ার, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহর মতো ব্যক্তিরা জেল খেটে এসেছেন। নিম্ন আদালতের মহামহিম ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃত আসামি ধরতে ব্যর্থতার কারণে পুলিশকে তিরস্কারের পরিবর্তে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রণীত চার্জশিট গ্রহণ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জও গঠন করে ফেলেছেন। 'স্বাধীন' আদালতের এই ভূমিকায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমি অবশ্য মোটেই অবাক হই না।

আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৫৫টি মামলার মধ্যে পুলিশের কর্তব্যকাজে বাধা প্রদান সংক্রান্ত কোতোয়ালি থানা পুলিশের মামলার সময়ে আমি পুলিশ কাস্টডিতে বন্দি ছিলাম। সেই বানোয়াট মামলায় পুলিশ আমাকে হুকুমদাতা হিসেবে এক নম্বর আসামি সাজিয়ে রিমান্ড আবেদন করলে ঢাকা সিএমএম আদালতের এক বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সেদিন আদালতে উপস্থিত সব আইনজীবীকে অবাক করে আমাকে একদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছিলেন। কোতোয়ালি থানার এক সময়ের বিতর্কিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন পরবর্তীকালে সেই মামলায় আমার বিরুদ্ধে চার্জশিটও প্রদান করেছে, যা বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় আছে। বর্তমান সরকারের পৌনে চার বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন দেখে আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, সিএমএম আদালতে সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী চার্জ গঠনও হয়ে যাবে। এ নিয়ে অবশ্য আমার কোনো দুশ্চিন্তা কিংবা

www.pathagar.com

ক্ষোভ নেই। তবে একটি প্রশ্নের জবাব পেলে কিছুটা অতিরিক্ত সান্ত্বনা পেতাম। পুলিশ কাস্টডিতে থেকে আমি পুলিশের কর্তব্যকাজে বাধা দিতে সক্ষম হলে সেই দুষ্কর্মে পুলিশের মধ্য থেকে নিদেনপক্ষ একজন হলেও সহায়তাকারী (Abbetor) থাকার কথা। আশ্চর্যজনকভাবে ওসি সালাহউদ্দিনের চার্জশিটে এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান মেলেনি।

বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক মামলায় সাবেক আইজিদের জেলে পাঠানোর রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। সাবেক একজন স্বরাষ্ট্র সচিবকেও বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমার জানামতে, ব্যক্তিজীবনে সৎ সেই ভদ্রলোককে রিমান্ডে নেয়ার আবেদনও আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো যে, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের আবেদন নাকচ করে তাকে জেলহাজতে পাঠিয়েছিলেন। ওসি সালাহউদ্দিনের মতো নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারাই সাবেক আইজি, সচিবদের অবমাননাকরভাবে পাকড়াও করে জেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার পরিবর্তন হলে এরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হচ্ছে না দেখে অবাকই লাগে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ওসি, ডিসিরা পর্যন্ত ইতিহাস থেকে কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ না করার পণ করে বসে আছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রলীগ এবং শিবিরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কলেজের শতবর্ষ পুরনো ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাসটি পুড়িয়ে দেয়। ওই ধ্বংসযজ্ঞে ছাত্রাবাসের তিনটি ব্লকের ৪২টি কক্ষ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও ৭০টি কক্ষ। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর এমসি কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলে তারা ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। কলেজের শতবর্ষ পুরনো যে ছাত্রাবাসটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিবেচনায় তার মূল্য নিরূপণ টাকার অংকে করা সম্ভব নয়। ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার হিসাব দিয়ে অমূল্য স্থাপনার এই অপূরণীয় ক্ষতি বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই।

এমসি কলেজ এবং সিলেট শহরের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতেই এই অকল্পনীয় বহ্ন্যুৎসব চালায়। তদন্ত প্রতিবেদনেও সিলেটের দলবাজ পুলিশের গাফিলতির উল্লেখ রয়েছে। ছাত্রাবাস পোড়ানোর পর দীর্ঘ দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে। পুলিশ এমসি কলেজের ২৫ জন শিবিরকর্মীকে গ্রেফতার করলেও আজ পর্যন্ত ছাত্রলীগের কোনো সন্ত্রাসীকে ধরার চেষ্টা চালায়নি। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ অকুস্থল পরিদর্শনে গিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে অশ্রুপাত করে এবং পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে

www.pathagar.com

দায়িত্ব সেরেছেন। অর্থমন্ত্রী এবং সিলেট সদরের সংসদ সদস্য আবুল মাল মুহিতও এমসি কলেজ পরিদর্শন করে ঘটনার কঠোর নিন্দা জানিয়ে তার কর্তব্য শেষ করেছেন। ঘটনাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী উভয়ই শুধু সিলেটের বাসিন্দাই নন, তারা এমসি কলেজেই লেখাপড়া করেছেন। মহাজোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সব সদস্য নাটক করায় যে সিদ্ধহস্ত, সেটি এমসি কলেজের ঘটনায় পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সুশীল (?) সমাজে একসময়ের বামপন্থী রাজনীতিবিদ শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে। সরকার ও সুশীলপন্থী অনেক মিডিয়াই তাকে একজন সফল শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রচার করে থাকেন। অথচ নূরুল ইসলাম নাহিদের জামানাতেই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটসহ প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্লজ্জ দলীয়করণের নজিরবিহীন তাণ্ডব চালিয়ে উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধাবীদের বাদ দিয়ে কেবল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এহেন শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বে থাকতে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসীরা তাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে এমসি কলেজের ছাত্রাবাসের মতো জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে না, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এদিকে ছাত্রলীগের অব্যাহত চাঁদাবাজিতে সিলেটের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব ও পুলিশ কোনোরকম উদ্যোগ না নিয়ে বরং প্রকারান্তরে সব অপকর্মে তাদের উৎসাহিত করছে। ছাত্র নামধারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা ক্রমেই আরও দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

তৃতীয় ঘটনা : রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে বাসের ধাক্কায় গত মাসের ২৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তৌহিদুজ্জামান নিহত হয়। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো রমনা এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শাহবাগ, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা কলেজ, নিউমার্কেট, টিএসসি, বাংলামোটরসহ সমগ্র রমনা এলাকায় শতাধিক যানবাহন ভাংচুর করে। বেশ কয়েকটি বাসে তারা আগুনও ধরিয়ে দেয়। পুলিশ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে শাহবাগ পুলিশ বক্সেও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।

যে দেশে বিরোধী দলকে শান্তিপূর্ণ মিছিল পর্যন্ত করতে দেয়া হয় না, প্রাইমারি স্কুলের দরিদ্র শিক্ষকরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়, শেয়ারবাজারে সর্বস্ব হারানো ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী লুটেরাদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে থানায় নিয়ে নির্যাতন করা হয়, সেই দেশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের নাকের ডগায় ছাত্রদের এমন তাণ্ডব চালানো বিস্ময়কর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা সম্ভব হওয়ার পেছনেও নিহত ছাত্রের দলীয় পরিচয় কাজ করেছে।

তৌহিদুজ্জামান ছাত্রলীগ সমর্থক ছিল। দুর্ঘটনার দিনে সে জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে ক্যাম্পাসে ফিরছিল। সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার। গত ঈদের ছুটিতেও রাজধানী থেকে দেশের বাড়িতে যাওয়া এবং ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় একশ'রও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ অনুযায়ী সেক্ষেত্রে অন্তত ১০ হাজার যানবাহন ভাংচুর হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু পার্থক্য হলো, ওইসব দুর্ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ব্যানারে ছাত্রলীগের কর্মীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম হয়নি। কাজেই দেশের অন্যত্র নিরপরাধ সাধারণ নাগরিকরা ২৯ আগস্ট রমনা এলাকার মতো আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন। সেদিন এতগুলো গাড়িতে ভাংচুর চালানো এবং আগুন দেয়া হলেও আজ পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো মামলা দায়ের হয়েছে এমন তথ্য আমার অন্তত জানা নেই। পুলিশ এই তাণ্ডবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে বাস পোড়ানোর ঘটনার মতো কোনো হুকুমের আসামিকেও খুঁজে বের করেনি। ঘাতক বাসটির ড্রাইভারকে অবশ্য গ্রেফতার করা হয়েছে।

যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করলাম, তার সবগুলো একই প্রকৃতির। গাড়ি ভাংচুর, আগুন লাগানো এবং ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে সম্পদের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে এবং দেশের আইন ভাঙা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী সবক্ষেত্রে প্রশাসনের অভিন্ন ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনের ঘটনায় মূল আসামিদের শনাক্ত করা না গেলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে হুকুমের আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান, দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। অপরদিকে সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে সন্ত্রাস চালানো ব্যক্তিদের মিডিয়া শনাক্ত করেছে। কলেজের নিজস্ব তদন্ত প্রতিবেদনেও তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারে আওয়ামী দালাল শ্রেণীর পত্রিকা ছাড়া দেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে এ সম্পর্কে একাধিক সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অথচ দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও একজন প্রকৃত অপরাধীকেও গ্রেফতার করা হয়নি। অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়েও শুধু রাজনৈতিক কারণে সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা কেবল জেলে

www.pathagar.com

গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায়ও পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে আটকের চেষ্টা করেনি।

ইলিয়াস আলী গুমের প্রতিবাদে তার নির্বাচনী এলাকা বিশ্বনাথ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলে জনগণের ন্যায্য আন্দোলন দমনে স্থানীয় প্রশাসন সেখানকার আওয়ামী লীগ ও মহাজোট সমর্থক ছাড়া প্রায় প্রতিটি পরিবারের পুরুষ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছিল। অনেকে গ্রেফতার হয়েছিল, বাকি অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে যাওয়ায় বিশ্বনাথ প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছিল। এরপরও বাংলাদেশে আইন নাকি সবার জন্য সমান, আদালত স্বাধীন এবং আইনের আশ্রয়লাভ সব নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এ-জাতীয় অন্তঃসারশূন্য গালভরা বুলি জনগণকে যুগের পর যুগ শুনে যেতে হয়। আইন সবার জন্য কতখানি সমান, এটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ব্যক্তিগতভাবে আমারও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

আদালত অবমাননা মামলায় আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনকালে আমি দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম। তারাও আমার মতো করে কিংবা আরও কঠোর ভাষায় বাংলাদেশের আদালতের সার্বিক অবস্থার সমালোচনা করে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়েছেন। আমার যুক্তি ছিল : তারা যদি আদালত অবমাননা মামলায় অভিযুক্ত না হন, তাহলে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য কেবল আমাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সংবিধানের ১৭ এবং ৩১ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় লর্ডশিপদের আইনের ব্যাখ্যা থেকে সেদিন জেনেছিলাম, কার বক্তব্যকে তারা আদালতের জন্য অবমাননাকর বিবেচনা করবেন, এটা সম্পূর্ণই তাদের এখতিয়ার।

ওই মামলাতেই Below Contempt নামে নতুন এক আইনি ভাষা শেখারও সুযোগ ঘটেছিল। আদালত যাদের বক্তব্যকে অবমাননা হিসেবে গ্রহণ করতে চান না, তাদের বেলায় নাকি Below Contempt নীতি প্রয়োগ করা হয়। আর আমাদের মতো হতভাগা আমজনতার ক্ষেত্রে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের ভাষায় শীতল হৃদয় (Cold Hearted) বিচারপতিরা তাদের সব ক্ষমতা (সংবিধান প্রদত্ত এবং তথাকথিত Inherent) নিয়ে শায়েস্তা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মোদ্দা কথা, ক্ষমতাসীন মহল এবং বিপুল বিত্তের অধিকারী শ্রেণী, যারা বেশুমার অর্থ ব্যয় করে আইন নিজের পক্ষে কিনে নিতে পারেন, তারা ছাড়া বাংলাদেশের বাকি নাগরিকদের প্রকৃতপক্ষে আইনের আশ্রয়লাভের কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি কল্যাণকামী, গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন আজ পর্যন্ত অধরাই থেকে গেছে। সংবিধান, আইন, সরকার ইত্যাদি নিজেদের মতো করে বানিয়ে বিভিন্ন কৌশলে শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের যাবতীয় অপকর্ম জায়েজ করে নিচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র নিজেই আজ একটি ভয়ানক নির্যাতক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এবং ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দুই দফায় আমরা নতুন করে গণমুখী রাষ্ট্র নির্মাণের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি। তৎকালীন শাসকরা এক ধরনের Status Quo বজায় রেখেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চেয়েছেন। ফলে ১৯৯০ সালের গণবিপ্লবের ২২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ সেই দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক স্বৈরাচারী নতুন করে ক্ষমতালাভের স্বপ্ন দেখতে পারছেন। শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কাকে তিনি ক্ষমতার অংশীদার বানাবেন, সে বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে সাক্ষাৎকার দেয়ারও ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশীও তাকে কেন্দ্র করে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনার সুযোগ পেয়েছে। দেশের স্বাধীনতাকামী জনতা ১৯৭৫ এবং ১৯৯০-এর মতো আরেকটি গণবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। আশা করি, তৃতীয়বার আমরা আর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। আগামী বিপ্লবে ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশের জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

বিভক্ত রায় : বাংলাদেশে অশনি সঙ্কেত

বাংলাদেশের ৪১ বছরের সকল মাননীয় প্রধান বিচারপতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তিটির নাম সম্ভবত স্কুলের একজন বালকও এখন জানে। সেই বহুল আলোচিত-সমালোচিত সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক গত সোমবার এর আগে চার-তিন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া সংক্ষিপ্ত আদেশের পূর্ণাঙ্গ বিভক্ত রায়ে স্বাক্ষর এবং প্রকাশ করেছেন। তার লেখা রায়ের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন, বিচারপতি এসকে সিনহা এবং বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

অপরদিকে, বিচারপতি খায়রুল হকের রায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে সাংবিধানিক অপরিহার্যতা উল্লেখপূর্বক ভিন্ন রায় লিখেছেন বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা এবং তার সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হয়েছেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই রায় তাই বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা এবং বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার যৌথ রায় রূপেই পরিগণিত হবে। বিচারপতি ইমান আলী ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের মূল নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং অবৈধ কিনা, সে প্রশ্নে বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তবে এই পদ্ধতি ভবিষ্যতেও অনুসরণ করা হবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তিনি সংসদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের যে বিভক্ত রায়ের ফলে বাংলাদেশ আজ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, দেশের সকল সচেতন নাগরিকের সেই রায় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনে আমি আইনজীবী কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নই। তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং বিচার বিভাগ সম্মিলিতভাবে গত তিন বছরে আমাকে ভালোমতই হাইকোর্ট দেখিয়েছে ও আইনের শিক্ষা দিয়েছে। এদের যন্ত্রণায় অনেকটা বাধ্য হয়ে সময় পেলেই অনানুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনের ছাত্র হওয়ার চেষ্টা করি। নিজের মামলা নিজে নিবিড়ভাবে দেখভাল না করলে তার পরিণতি কী হতে পারে, সেটা খানিকটা আমরা বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

www.pathagar.com

ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির মামলার পরিণতিতে দেখতে পেয়েছি। আমি অন্যের ভরসায় নিশ্চিন্ত থেকে সে রকম ভুল করতে রাজি নই। যাই হোক, যৎসামান্য লেখাপড়া জানা সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন দেশের একজন নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এবার একই সাংবিধানিক প্রশ্নে আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতিদের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা যথাসম্ভব আইনের কূটকচালি এড়িয়ে বুঝবার চেষ্টা করব।

আজ থেকে ১৬ মাস আগে গত বছরের ১০ মে সুপ্রিমকোর্টের সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ (Short Order) দিয়েছিল। সেই সময় প্রধান বিচারপতির আসনে বসে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকই আদেশটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। সেদিন সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে আপিল মঞ্জুর করা হলো। সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬ (আইন-১ : ১৯৯৬) এখন থেকে বাতিল ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হলো। তবে দশম এবং একাদশ সংসদ নির্বাচন উল্লিখিত সংশোধনীর অধীনে হতে পারে। কারণ আইনের বহু পুরনো নীতি–কোনো কিছু বেআইনি হলে প্রয়োজনের তাগিদে তা আইনসম্মত; রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন।

আদেশে আরও বলা হয়েছিল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগের বিধান বাতিলের বিষয়ে সংসদ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গত ষোল মাস ধরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী মহাজোট এবং বিরোধী দল বিএনপি তাদের মতো করে সংক্ষিপ্ত আদেশের ব্যাখ্যা জনগণের কাছে তুলে ধরেছে। আওয়ামী লীগ কালবিলম্ব না করে সংক্ষিপ্ত আদেশের সুবিধাবাদী এবং একপেশে ব্যাখ্যার আলোকে সংসদে একতরফা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধনী গ্রহণ করিয়ে নিয়েছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের দখল নেয়ার উদ্দেশ্যেই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দুষ্কর্মটি করেছেন, সেটা বাংলাদেশের জনগণ ভালোই বোঝেন।

অপরদিকে বিএনপি রায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোকে আরও দু'টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সম্পন্ন করার জন্য পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবি জানিয়ে এসেছে। দেশের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দৃশ্যত বিএনপির অবস্থানকেই সমর্থন করছে। বাংলাদেশের সুশীল (?) সমাজ যারা অতীতে বিভিন্ন বিষয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন, তারাও এক্ষেত্রে গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে অন্তত দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন আগের মতোই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিচারপতি খায়রুল হকের লিখিত পূর্ণাঙ্গ রায় পড়ার পর যে কোনো

www.pathagar.com

চিন্তাশীল নাগরিকের মনে হতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে আওয়ামী লীগকে একঘরে অবস্থান থেকে পরিত্রাণ দিতেই উন্মুক্ত আদালতে ১৬ মাস আগে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত আদেশ থেকে সরে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ রায়ে কর্তার ইচ্ছায় প্রয়োজনীয় ঘষা-মাজা করা হয়েছে।

২০১১ সালের ১০ মে তারিখে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত রায়ে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের স্থলে রাষ্ট্রের অন্য কোনো উপযুক্ত নাগরিককে নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অথবা প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন না, এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত সংক্ষিপ্ত আদেশে ছিল না। অথচ, পূর্ণাঙ্গ রায়ে বিচারপতি খায়রুল হক তার আগের ঘোষিত অবস্থান পরিবর্তন করে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সরাসরি নির্দেশনা দিয়ে সংসদের সেই ক্ষমতা হরণ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছুদিন ধরে অব্যাহতভাবে বলে যাচ্ছিলেন যে, কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তির হাতে তিনি ক্ষমতা অর্পণ করবেন না। এই অবস্থান গ্রহণের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থেকেই পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় পরিকল্পনা আঁটছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং মহাজোটের মন্ত্রীকুলও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাও বহুবার দিয়েছেন। বিচারপতি খায়রুল হকের চূড়ান্ত রায়ে শেখ হাসিনার ইচ্ছার হুবহু প্রতিফলনকে কেবল কাকতালীয় বিবেচনা করা কঠিন। তাছাড়া, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি খায়রুল হক তার রায় ঘষা-মাজার বিষয়টি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাকে রায়ে দ্বিতীয়বার কেন স্বাক্ষর করতে হয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, প্রথমবার চূড়ান্ত রায়ে স্বাক্ষর করার পর অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার স্বাক্ষর করতে হয়েছে। এই স্বীকারোক্তির পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল সংক্রান্ত রায়ের স্বচ্ছতা নিয়ে জনমনে অবশ্যই প্রশ্নের সৃষ্টি হবে।

দেশের বরেণ্য আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক উল হক এই ঘষা-মাজার বিষয়টিকে Gross mistake (গুরুতর ভুল) এবং mis-conduct (অসদাচরণ) রূপে বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশের বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন একে সরাসরি প্রতারণা বলেছেন। একবার রায় লেখার পর সেখানে কী, কেন এবং কোথায় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে, সেটা জনগণকে জানানো এখন সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের অবশ্য পালনীয় নৈতিক দায়িত্ব। সংক্ষিপ্ত আদেশে প্রধান উপদেষ্টা পদে

www.pathagar.com

তিনি নির্বাচিত ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করলেও চূড়ান্ত রায়ে কার নির্দেশে অথবা কাকে সন্তুষ্ট করতে এই পরিবর্তন করা হলো সেই প্রশ্নের জবাবও তাকে দিতে হবে। এর মধ্যে বিচারপতি খায়রুল হক এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দেয়া বিভক্ত রায়কে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে এবার অসদাচরণ ও শপথ ভঙ্গের অভিযোগও উত্থাপিত হলো।

আমাদের বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ অধঃপতন নিয়ে লেখালেখি করে জেল খেটেছি। সেদিন যারা আমাকে সাজা দিয়েছিলেন, আজ তাদেরই জনগণের আদালতে অভিযুক্ত হতে দেখে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে দেশের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বরং বিমর্ষ হচ্ছি। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক লিখিত চূড়ান্ত রায় নিয়ে আরও কথা আছে। সংক্ষিপ্ত রায়ে অতিরিক্ত দুই মেয়াদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা থাকলেও চূড়ান্ত রায়ে নেই কেন, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি মিডিয়াকে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বিচারপতি খায়রুল হকের সঙ্গে তারই মতাদর্শের অন্য তিন বিচারপতির মতদ্বৈধ থাকায় এমনটি ঘটেছে। অবশ্য বিরোধটা ঠিক কোন জায়গায়, তা তিনি আর খোলাসা করেননি। এমতাবস্থায় এই রায়কে কেবল বিভক্ত বললেই বিভ্রান্তির প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে না। এটিকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে 'চালাকিপূর্ণ বিভক্ত রায়' নামে অভিহিত করে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করা যায় কিনা, সে বিষয়ে দেশের সব বিশিষ্ট আইনজীবী ভেবে দেখতে পারেন।

বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা প্রধান বিচারপতিসমেত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ১৭৮ পৃষ্ঠার রায় লিখেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখেছেন, ষষ্ঠ সংসদে গৃহীত ত্রয়োদশ সংশোধনীতে গণতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতা পৃথককরণ এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস হয়নি। বরঞ্চ, ত্রয়োদশ সংশোধনী এক সাংবিধানিক অপরিহার্যতা। ১৯৯৬ সালে দেশের অরাজক পরিস্থিতির উল্লেখ করে বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা লিখেছেন, গণতন্ত্রের ডুবন্ত নৌকা রক্ষা করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার; অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন করতে হলে এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হলে নিশ্চিতভাবেই দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যেমনটি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব পড়বে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হবে। দেশ এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পেছনে চলতে শুরু করবে। গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে এই ব্যবস্থা জনগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

বিচারপতি খায়রুল হকের চূড়ান্ত রায়ের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, তার পূর্ণাঙ্গ রায় এর আগে দেয়া সংক্ষিপ্ত রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞার এই ভয়ানক অভিযোগের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রায়ের কোনো রকম কার্যকারিতা আদৌ থাকে কীনা, সেটাই এখন দেশের ষোল কোটি নাগরিককে বিবেচনা করতে হবে। বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞার রায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছেন। বিচারপতি ইমান আলী ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো উপাদান খুঁজে পাননি। এ প্রশ্নে তিনি বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা এবং বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার মতামতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী আপিল বিভাগের তৃতীয় বিচারপতি ইমান আলী লিখেছেন, In conclusion, I find that the Thirteenth Amendment was neither illegal nor ultra vires the Constitution and does not destroy any basic structures of the Constitution. অর্থাৎ উপসংহারে আমি দেখছি যে, ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ অথবা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং এর দ্বারা সংবিধানের কোনো মূল কাঠামোকে ধ্বংস করাও হয়নি। ২০০৭ সালের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উল্লেখ করে বিচারপতি ইমান আলী অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির ভবিষ্যৎ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় সংসদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

তবে সংসদের প্রতি তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, Nevertheless, whatever new system is introduced, it will have to be acceptable to the people for it to have durability. অর্থাৎ, তথাপি, যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক না কেন, সেটি টিকতে হলে অবশ্যই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হবে। আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে আওয়ামী লীগের শঠতাপূর্ণ চালাকিটা বিচারপতি ইমান আলী ধরতে পেরে তার রায়ের মাধ্যমে পুরো বিতর্ক পুনরায় সংসদেই ফেরত পাঠিয়েছেন।

মোদ্দা কথা, আপিল বিভাগের সাতজন বিচারপতির মধ্যে তিনজন বিচারপতি খায়রুল হকের স্ববিরোধী আইনি ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথাকে কেবল সংবিধানসম্মতই বলেননি, সেই সঙ্গে ত্রয়োদশ সংশোধনীকে সাংবিধানিক অপরিহার্যতা বলে রায় দিয়েছেন। স্মরণে রাখা দরকার, হাইকোর্ট বেঞ্চও ত্রয়োদশ সংশোধনীকে সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিবেচনা করেই এর আগে বাদীর রিট খারিজ করে দিয়েছিলেন। বাদী হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে বিষয়টি আপিল বিভাগ পর্যন্ত গড়ায়। সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক অতি উৎসাহী হয়ে

www.pathagar.com

মামলাটি কার্য তালিকায় নিয়ে আসেন এবং অবসর গ্রহণের মাত্র সাতদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রদান করেন।

এছাড়া মামলার বিচারকার্য চলাকালে আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়ে আদালতকে সহায়তা প্রদানের জন্য আটজন amici curiae (আদালতের বন্ধু)'র মধ্যে একমাত্র আজমালুল হোসেন কিউসি ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। জাস্টিস টিএইচ খান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ড. এম জহির, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম এবং ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ তাদের বক্তব্যে সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সম্পৃক্ত না করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। সুতরাং বিচারপতি খায়রুল হক আদালতের বন্ধুদের পরামর্শ উপেক্ষা করে যে একপেশে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রদান করলেন, সেটি জাতিকে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এবং বৃহত্তর ও গভীরতর বিভক্তির দিকে ঠেলে দেবে।

এ পর্যন্ত বিচারপতিদের প্রদত্ত রায় থেকে আইনের খানিকটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, আসল কথা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিরোধটি পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং এর সমাধানও আমাদের আদালতের বাইরে রাজনীতির ময়দানেই খুঁজতে হবে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সব বিরোধীদলের তীব্র আন্দোলনের কাছে পরাজিত হয়েই বিএনপিকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা মেনে নিতে হয়েছিল। যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এখন মহা এলার্জি, তিনিই তখন নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার ব্যবস্থার জঙ্গি সমর্থক ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী দলের নীতিনির্ধারকদের মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনা ধার করে আওয়ামী লীগ সেই সময় এই প্রথাকে তাদের নিজস্ব বলে দাবি করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি।

শেখ হাসিনার স্তাবকরা এই 'যুগান্তকারী' পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সম্ভব হলে তাকে নোবেল পুরস্কারও দিয়ে ফেলেছিলেন। রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মহাজোট নেত্রীর জুড়ি নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অনির্বাচিত ব্যক্তি তার কাছে অস্পৃশ্য হলেও তিনি কিন্তু একগাদা অনির্বাচিত উপদেষ্টা দিয়েই বর্তমানে সরকার চালাচ্ছেন। মাত্র দু'দিন আগে পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পুনরায় পাওয়ার মরিয়া চেষ্টায় ওয়াশিংটনে কোনো নির্বাচিত মন্ত্রী, এমপি'র পরিবর্তে তিনি ড. গওহর রিজভী এবং এইচটি ইমামকে পাঠিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তারা উভয়েই প্রধানমন্ত্রীর অনির্বাচিত উপদেষ্টা। আসল কথা হলো, যে কোনো পন্থায় ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা দখলে রাখতে চান।

www.pathagar.com

ধারণা করছি, শেখ হাসিনার ভারতীয় গোয়েন্দা বন্ধুরা ইতোমধ্যে দেশে তার জনপ্রিয়তায় ধসের বিষয়টি অবহিত করেছে। সরকারের চরম অজনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে তিনি অপারগ। তবে, ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার যে খেলায় প্রধানমন্ত্রী অবতীর্ণ হয়েছেন, ইতিহাসে তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কখনও সুখকর হয়নি। ১৯৭৫ সালেও চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ফ্যাসিবাদী বাকশাল ব্যবস্থা কায়েম করে এক ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ব্যর্থ চেষ্টা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল। গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসক পরিবর্তনের সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক সময় বিস্ফোরিত হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম।

বিএনপি'র আপাত সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে ক্ষমতাসীনরা ভাবতে পারেন ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ে লাগাতার তীব্র আন্দোলন কিংবা ২০০৬ সালে একতরফা নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে লগি-বৈঠার আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা দলটির নেই। আন্দোলন দুর্বল করে দেয়ার জন্য নানারকম কৌশলের কথাও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকুলের মাথায় থাকতে পারে। এজেন্ট অনুপ্রবেশ করিয়ে বিএনপিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি অথবা ভাঙন ধরানো, ভিন্ন মত দমনে সাহারা খাতুনের চেয়েও কঠোরভাবে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চণ্ডনীতি প্রয়োগ, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার বিভাগকে আরও নগ্নভাবে ব্যবহার ইত্যাদি সেসব কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিএনপির একশ্রেণীর নেতার মধ্যে আন্দোলন ব্যতিরেকে ক্ষমতায় যাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখার পেছনেও যে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কোনো হাত নেই, এমন কথাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না। এজেন্সির লোকজন দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ২০০৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন বলেই শোনা যায়।

কিন্তু, বিএনপির প্রায় তিন যুগের ইতিহাসে বারংবার দেখা গেছে দলটির শক্তির প্রধান উৎস যথাক্রমে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অতুলনীয় সততা ও দেশপ্রেমনির্ভর ব্যক্তি ইমেজ, বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা, তৃণমূল কর্মীদের সাহস ও আনুগত্য এবং দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যকার নীরব অংশের সমর্থন। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের সময় থেকে এ দেশের স্বৈরশাসকরা সর্বাধিকবার বিএনপিকে ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেয়ে বিএনপি ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা ক্যান্টনমেন্টে জন্মের বিরামহীন প্রচারণা চালিয়েও দলটিকে আজ পর্যন্ত জনবিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রশাসনের বৈরিতা, মিডিয়ার একতরফা প্রচার, দলের অভ্যন্তরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বন্ধুহীনতা, নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনের পক্ষপাতিত্ব এবং ডিজিটাল ভোট কারচুপি সত্ত্বেও বিএনপি ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনসমূহে বিএনপি তার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি সময়ের বিচারে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও পৌরসভায় বিজয়ী হয়েছে। নানাবিধ সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দলটি ব্যাপক আন্দোলনও যে গড়ে তুলতে সক্ষম, সেটাও ইলিয়াস আলী গুমকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী প্রতিবাদ, বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপশাসনে জনগণ যে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, সেই বাস্তবতা থেকে তাদের পরম মিত্র ভারতও এখন আর দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে পারছে না। নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবির প্রতিও অন্ধ আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসক এরশাদ ব্যতীত দেশের সব নাগরিকের নৈতিক সমর্থন রয়েছে।

সুতরাং, বেগম খালেদা জিয়া আপসকামীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিলে জনসমর্থনের অভাব হবে না বলেই অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মইন-ফখরুদ্দীন আমলে প্রশাসন কর্তৃক একতরফা বিএনপি ধ্বংস অভিযান পরিচালনা এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে অবিশ্বাস্য পরাজয় সত্ত্বেও বিএনপি আজও দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একমাত্র প্রতীক রূপে দণ্ডায়মান। ২০০৯ সালে দেশি-বিদেশি যে চক্র বিএনপিকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সঙ্গে তুলনা করে ঠাট্টা-তামাশা করত, তারাই আজ নিরপেক্ষ নির্বাচনে দলটির জয়লাভের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তৃণমূল কর্মীদের অবিচল আস্থার কারণেই বিএনপি ভস্ম থেকে একাধিকবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। দলের এই কর্মী বাহিনীর সঙ্গে দেশের সাধারণ বিক্ষুব্ধ জনগণ মিলিতভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অংশ নিলে কোনো নির্যাতনই তাদের পরাভূত করতে সক্ষম হবে না। আদালতের রায় বিশ্বে কোথাও গণদাবিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা তার রায়ে দেশে নিশ্চিত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দেয়া বিভক্ত রায়ের প্রতিক্রিয়ায় দেশ সে দিকেই ধাবিত হচ্ছে। আপিল বিভাগের বিচারপতিকুলসহ যাদের দলীয় সঙ্কীর্ণতা, বিবেকহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতায় বাংলাদেশে আবারও গণতন্ত্র ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

জনদুর্ভোগে বিরোধী দলের নীরবতা

গত সপ্তাহে ভারতে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি'র ডাকে দেশব্যাপী 'ভারত বন্ধ' পালিত হলো। ড. মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকারের জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই মূলত এই হরতাল আহ্বান করেছিল সে দেশের বিরোধী দল। বিজেপি'র প্রতিবাদের পেছনে আরও একটি অতিরিক্ত কারণের কথাও অবশ্য বলা হয়েছে। গত কিছুদিন ধরে ভারতে রিটেইল খাতে (Retail Sector) বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হবে কি না, সে নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছিল। শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের 'মিলি-ঝুলি' অর্থাৎ কোয়ালিশন সরকার বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিলে বিজেপি এবং বামদলগুলো তাতে আপত্তি উত্থাপন করেছে। এই আপত্তির পেছনে বামদলগুলোর আদর্শিক কারণ থাকলেও চরম ডানপন্থী বিজেপির অবস্থান অবশ্য রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ-ইসরাইলপন্থী অবস্থান ও রাষ্ট্রটির পুঁজিবাদী অর্থনীতির কট্টর সমর্থক হিসেবে সাম্প্রদায়িক বিজেপি সবিশেষ পরিচিত। সুতরাং, ভারতে অভ্যন্তরীণ দোকানদারিতে বিদেশি বিনিয়োগে বিজেপি'র আপত্তি স্ববিরোধিতামূলক ও বিস্ময়কর। যা-ই হোক, এ সবই আমাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশীর একেবারেই ঘরোয়া মামলা। ভারত বন্ধ সম্পর্কিত আরেকটি তথ্যের বিষয় উল্লেখ করেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসব।

গত সপ্তাহে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ইউপিএ'র অংশীদার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আঞ্চলিক দলটির যে ছয়জন মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তারাও একযোগে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু হরতালে অংশগ্রহণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে আবার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছে। মোটকথা, এক জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে তোলপাড় ঘটে গেছে এবং দিল্লিতে কোয়ালিশন সরকারকে নানারকম সমীকরণের আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতায়

www.pathagar.com

কোনো রকমে টিকে থাকতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, সারা ভারতে এত বড় হরতাল হলেও সে দেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত 'আমি হরতালকে ঘৃণা করি' (I hate Hartal) বলে সংবাদমাধ্যমে হুংকার দেয়ার সাহস করেননি। এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসি।

ভারতে যেদিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল চলছিল, সেই একই দিনে বাংলাদেশের অসংখ্য কথিত স্বাধীন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার একটি, বিইআরসি (বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন) ২০১২ সালে নয় মাসের সময়কালে তৃতীয়বারের মতো বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে এটা বিদ্যুতের ষষ্ঠ দফা মূল্যবৃদ্ধি। এই ছয় দফায় সাধারণ ভোক্তাদের কাঁধে প্রায় সাড়ে তিনগুণ বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রায় প্রতিটি বক্তৃতাতেই বাংলাদেশকে লোডশেডিংমুক্ত করার দাবি করছেন। দেশ লোডশেডিংমুক্ত না হলেও কুইক রেন্টালের কল্যাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন যে বেড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্নীতির বোঝায় জনগণকে পিষ্ট করে মহাজোট সরকার যে নব্য তরিকায় বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন, তাতে দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দেয়া হয়েছে। কুইক রেন্ট'ল প্রকল্পগুলো মন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং মহাজোটের এমপি ও অন্যান্য নেতার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করে রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনের পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করেছে মহাজোট সরকার।

মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনকালে দুর্নীতিকে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গেছেন। বিএনপির গত সরকারের আমলে এক-দুই কোটি টাকার দুর্নীতির গল্প পত্রিকায় সাত কলাম হেডলাইন ট্রিটমেন্ট পেত। এখন হাজার কোটির নিচে কোনো কথা নেই। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে রাতারাতি কোটিপতি বানানোর 'মহৎ' উদ্দেশ্যে দুই কোটি টাকা মূল্যের সরকারি কন্ট্রাক্ট বিনা টেন্ডারে দেয়ার বেআইনি পদ্ধতি জায়েজ করা হয়েছে। একইভাবে বিনা টেন্ডারে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কার্যাদেশ হালাল করার জন্য ইনডেমনিটির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। ক'দিন আগে সেই ইনডেমনিটির মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার। চারশ' কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন বিশিষ্ট ব্যাংকের লাইসেন্স যাদের দেয়া হয়েছে, সর্বশেষ অর্থবছরের আয়কর নথি অনুযায়ী তাদের সাদা টাকার পরিমাণ দুই-এক কোটি টাকার উর্ধ্বে নয়। অর্থাৎ এই সরকারের শাসনামলে এসব ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে কালো টাকার পাহাড় গড়েছেন। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরও এজাতীয় একটি ব্যাংকের (ফার্মার্স ব্যাংক) মালিক হয়েছেন। এই না হলে ডিজিটাল সরকারের দিনবদল! বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

www.pathagar.com

জনমতের কোনো তোয়াক্কা না করে সরকার এত বড় জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করলেও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি কেবল ছোট্ট একটি বিবৃতি দিয়েই তাদের দায়িত্ব সেরেছে। আমার সম্পাদিত পত্রিকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিটি শেষের পাতায় সিঙ্গেল কলামে ছাপা হয়েছে। অন্যান্য পত্রিকায় ট্রিটমেন্ট খেয়াল করিনি। তবে ধারণা করছি, দলীয় মুখপত্র দিনকাল ছাড়া অন্য কোনো জাতীয় সংবাদপত্রেই বিবৃতির খবর এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়নি। ২০০১ থেকে ২০০৬–এই পাঁচ বছরের মধ্যে বিএনপি সরকার মাত্র একবার বিদ্যুতের মূল্য প্রতি ইউনিট ২৪ পয়সা হারে বৃদ্ধি করেছিল। যতদূর মনে পড়ে, তাতেই আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি দিয়েছিল। বাংলাদেশের ভুলো মনের নাগরিকরা এসব ইতিহাসও ভুলে বসে আছেন। বছর খানেক আগে একবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপিও সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছিল। সে সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছিলেন, তার কাছে তথ্য আছে যে বিএনপির শীর্ষপর্যায়ের নীতিনির্ধারকরা নাকি সেই হরতাল ডাকার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, একটি বিশেষ পত্রিকার সম্পাদকের পীড়াপীড়িতেই তাদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত দলের চেয়ারপার্সন সেই হরতালের কর্মসূচি দিয়েছিলেন। সচেতন পাঠকমাত্রই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সেদিন সৈয়দ আশরাফ বিশেষ সম্পাদক বলতে কার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

যারা নিয়মিত টকশো দেখে থাকেন তাদের স্মরণে পড়ার কথা, নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরসহ আরও বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় টকশো স্টার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে ডাকা হরতালকে সমর্থন করে বলেছিলেন, এই প্রথম বিএনপি জনগণের ইস্যু নিয়ে হরতাল ডাকলো। শুধু সর্বশেষ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নয়, মহাজোট সরকারের পৌনে চার বছরের সর্বব্যাপী অপশাসনে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছালেও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে কার্যকরভাবে তার প্রতিবাদ জানাতে পারেনি বলেই জনমনে ধারণা রয়েছে। বারবার জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলে খাদ্য এবং খাদ্যপণ্যবহির্ভূত প্রতিটি পণ্যের মূল্য কয়েকগুণ বেড়েছে। সাধারণ নাগরিকের নিট আয় হ্রাস পাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভয়াবহ অপশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল আন্দোলনের কোনো সমন্বিত পরিকল্পনা জনগণের সামনে এখনও হাজির করতে পারেনি। অবশ্য এটাও ঠিক যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬–বিএনপির শাসনামলের এই দশ বছরে আওয়ামী লীগ এতবার হরতাল

www.pathagar.com

ডেকেছে যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে হরতালের ধার অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। কাজেই অতিব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত কর্মসূচির ব্যবহারে অনেকটা বাধ্য হয়েই হয়তো বিএনপিকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তারপরও বেশ কিছু ইস্যুতে বিএনপির নীরবতা সাধারণ নাগরিকদের হতাশ করেছে। অন্য ইস্যু বাদ দিয়ে কেবল এই সরকারের পাহাড়সমান দুর্নীতির বিষয়গুলোতে বিএনপির ভূমিকা পর্যালোচনা করা যাক।

২০১০ সালে শেয়ারবাজার থেকে সরকারঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কারসাজির মাধ্যমে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা লুট করেছে। লাখ লাখ সাধারণ বিনিয়োগকারী সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে, কয়েকজন নিঃস্ব হওয়ার যাতনা সইতে না পেরে পরিবার-পরিজনকে সংসারসমুদ্রে অসহায় অবস্থায় ভাসিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিবাদ করলে সরকার লুটেরাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রতিবাদকারীদের ওপরই রাষ্ট্রের নিবর্তনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের যারা সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন, তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। আন্দোলন না করার অঙ্গীকারের বিনিময়ে শেষপর্যন্ত তারা ছাড়া পেয়েছেন। সেই ন্যায্য আন্দোলনে বিএনপি বিনিয়োগকারীদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। দলীয় কার্যালয়ের সামনের পথসভা এবং প্রেস ক্লাবকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শেয়ারবাজার লুটের ঘটনা নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলেও বিস্ময়করভাবে প্রধান বিরোধী দল অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি নিয়ে কোনো কার্যকর আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আমার ধারণা, এই নির্মম জালিয়াতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিলে সাধারণ জনগণ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাতো।

রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এপিএস গভীর রাতে মন্ত্রীর বাসস্থানের নিকটবর্তী জায়গায় বস্তাবন্দি নগদ ৭০ লাখ টাকা (অনেকে বলেন টাকার অংক কয়েক কোটি) নিয়ে বমাল ধরা পড়লেও বিরোধী দল ইস্যুটি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। এপিএসে'র গাড়ির সাহসী চালককে গুম করে ফেলা হলেও দেশে তার প্রতিবাদও তেমন তীব্র হয়নি। এই ঘৃণ্য কাণ্ড বিএনপি সরকারের আমলে ঘটলে কতদিন হরতাল চলতো এবং কী পরিমাণ সহিংসতার সৃষ্টি হতো, সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। যেসব টেলিভিশন চ্যানেলের উপস্থাপক ওই আমলে তৎকালীন মন্ত্রীদের কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই লাইভ অনুষ্ঠানে সরাসরি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করতেন, তারাই সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ঘুষের টাকা ধরা পড়া সত্ত্বেও তাকে বিভিন্ন টকশোতে ডেকে নিয়ে মহান রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রচারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের এই বর্ষীয়ান নেতাও জাতিকে প্রায় প্রতিদিন নসিহত করতে কোনোরকম লজ্জাবোধ করছেন না। সরকারি দলের

www.pathagar.com

আরেক বর্ষীয়ান নেতা তোফায়েল আহমেদ তাকে কম কথা বলার পরামর্শ দিলেও কোনো কাজ হয়নি। নিদেনপক্ষে নৈতিক কারণে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে টেলিভিশন টকশোতে বয়কট করা উচিত হলেও সেটাও বাস্তবে ঘটেনি।

ইউনিপেটু, ডেসটিনি এবং হলমার্কের ঘটনায় ব্যবসায়ী নামধারী দুর্বৃত্তরা অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা সরাসরি জনগণের পকেট কেটে অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে লোপাট করেছে। যে তিনটি কোম্পানির নাম উল্লেখ করলাম, তার প্রতিটিতে মন্ত্রী, উপদেষ্টা অথবা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা জড়িত রয়েছেন। তিন কোম্পানির লুটপাটের কাহিনী দুর্নীতির ভাসমান হিমশৈলের ক্ষুদ্র চূড়া মাত্র। পৌনে চার বছরের মোট দুর্নীতির হিসাব কষলে যে কোনো নাগরিকের মাথা ঘুরে যাবে। এসব চিহ্নিত দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগও বিএনপির নীতিনির্ধারকরা হাতছাড়া করেছেন। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, ক্ষমতাসীন মহলের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী অংশের দুর্নীতির সর্বপ্রথম সংবাদ প্রকাশ করেই আমার দেশ পত্রিকাকে সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। জনগণকে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য জানানোর অপরাধে বছর খানেক জেল খাটানোর পর ই-মেইলে এখন আমাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা আমাকে নাকি সারাজীবনের জন্য জেলে পুরবেন। আমার বিরুদ্ধে ৫৭টি মামলা দায়েরের পর এখন পত্রিকা কার্যালয়ে তদন্তের নামে পুলিশ পাঠিয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সারা বিশ্বের ফ্যাসিস্ট শ্রেণী মুক্তচিন্তাকে এভাবেই দমনের চেষ্টা করে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আগে বহুবার উচ্চারিত উক্তি আবারও করছি। কোনো ভীতি প্রদর্শন অথবা চাপ প্রয়োগেই আমার দেশকে সত্য সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত রাখা যাবে না।

মহাজোট সরকারের বেশুমার দুর্নীতির কাহিনীর মধ্যে বিশ্বময় সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারি। সম্প্রতি শর্তসাপেক্ষে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নে পুনর্বার আলাপ-আলোচনার ঘোষণা করতেই মন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই ঘোষণার দিনটি বাংলাদেশের জন্য খুবই শুভ। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক দাবি করেছেন, বিশ্বব্যাংকের নতুন ঘোষণা আওয়ামী সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের প্রমাণ। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র এবং দলীয় সভানেত্রীর প্রভাবশালী উপদেষ্টা মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এটা প্রমাণ

www.pathagar.com

করেছে–দেশ ও জনগণের স্বার্থ বড়, দলীয় স্বার্থ নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে হলে লজ্জাগ্রন্থি যে পুরোপুরি কেটে ফেলে দিতে হয়, সেটা বর্তমান সরকারের লোকজন ভালোভাবেই প্রমাণ করলেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে নতুন করে ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে–এ ধরনের কোনো নিশ্চয়তা তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে দেয়া হয়নি। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের কথিত স্বাধীন দুদককে তাদের নির্দেশে পদ্মা সেতু প্রকল্প সম্পর্কিত দুর্নীতির তদন্ত পরিচালনা করার শর্তসহ চারটি নতুন শর্ত দিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার দৃশ্যত সেসব অবমাননাকর শর্ত মেনে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আগের বাগাড়ম্বরগুলো স্মরণ করলে সরকারের অসহায় আত্মসমর্পণের জন্য গলাবাজির পরিবর্তে তার পারিষদবর্গের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাংক যদি অর্থায়ন করেও, তাতেও কিন্তু সরকারের উচ্চ মহলের দুর্নীতির দুর্গন্ধ চাপা পড়ে যাচ্ছে না। আবুল হোসেন, মসিউর রহমান গং প্রকাশ্যে এবং আরও দুর্নীতিবাজ ক্ষমতাশালীরা অপ্রকাশ্যে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ঘৃণিত হয়েই থাকবেন। বাড়িঘরের আড্ডায় সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন উপস্থিত থাকতে পারলে সেখানে বর্তমান সরকারের মূল চালকদের উদ্দেশে তিরস্কারের যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো শুনে কানে আঙুল দিয়ে তাদের পালিয়ে আসতে হতো। উচ্চ মহলের দুর্নীতির জন্য পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে যে বিলম্ব হবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, তার কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির দায়ভার বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরই নিতে হবে। অবধারিত সাজা বিলম্বিত করার প্রয়াসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার অপচেষ্টা গণপ্রতিরোধে অবশ্যই পরাভূত হবে।

যাই হোক, দুর্নীতিবাজ শাসকশ্রেণী বাংলাদেশের জনগণের এত বড় ক্ষতি করা সত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দল তার প্রতিবাদেও এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে মাঠে নামেনি। স্মরণ করা যেতে পারে যে, যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনে, আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে উপস্থিতিতে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ হরতাল দিয়েছিল। অথচ কী আশ্চর্য, সেই সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর তার নাম পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে নামকরণ করতেও ক্ষমতাসীনরা কোনোরকম লজ্জাবোধ করেনি। অপরদিকে পদ্মা সেতুকে উপলক্ষ করে নজিরবিহীন দুর্নীতি হলেও এবং বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে ঋণ বাতিল করলেও তার প্রতিবাদে বিরোধী দল কোনো কর্মসূচি প্রদান থেকে বিরত থেকেছে।

www.pathagar.com

অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সরকারের ফ্যাসিবাদী দমননীতি বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের যথেষ্ট পরিমাণে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত জেল ও রিমান্ডের ভয়ে বিএনপির নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের পরিবর্তে সময়ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করেছেন। কোনোক্রমে আর একটি বছর পার করতে সক্ষম হলেই আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের সুখস্বপ্নে তারা বিভোর। কিন্তু হাজার কোটি টাকার প্রশ্ন হলো, অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ধসের প্রেক্ষাপটে মহাজোট সরকার দেশে আদৌ কি কোনো অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন দেবে? যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকই বুঝতে পারবেন, অর্থবহ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার কোনোরকম সদিচ্ছা থাকলে সাবেক বিতর্কিত প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে দিয়ে মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা তাদেরই সহিংস আন্দোলনের ফসল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির কবর রচনা করতেন না।

বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের রাজধানীর সব দামি হোটেলে বিদেশি কূটনীতিকদের আপ্যায়নের ধুম দেখে মনে হচ্ছে, ২০০৭ সালে আওয়ামী লীগের কৌশল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা আশা করছেন, আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। ইউএনডিপি'র তৎকালীন স্থানীয় প্রতিনিধি মিজ রেনাটা ডেসালিয়েন জাতিসংঘের নাম ব্যবহার করে সে সময় যে পন্থায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন, এবারও তার পুনরাবৃত্তির আশা বিরোধী রাজনীতিবিদরা করতেই পারেন। তবে বাস্তবতা হলো, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের বিষয়ে পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি আমাদের কাছে সুপরিচিত। কোনো আদর্শ বাস্তবায়ন নয়, বরঞ্চ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করাটাই তাদের কাছে মুখ্য। সুতরাং, ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং ব্রাসেলসের নীতিনির্ধারকরা যদি বিবেচনা করেন যে, বর্তমান সেক্যুলার সরকারই তাদের স্বার্থের অনুকূল তাহলে বাংলাদেশে একটি সাজানো নির্বাচনের বিষয়ে তারা চোখ বুজেই থাকবেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের কিছু মুখরোচক কথাবার্তা ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকরা হয়তো বলবেন; কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত থেকেও পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থান সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। দুর্নীতির দায়ে আবুল হোসেন পদত্যাগ করলেও তারই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সাকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালককে মন্ত্রী বানানোর বিষয়টি বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অনেকের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকেছে। গল্পের এখানেই শেষ নয়। নবনিযুক্ত মন্ত্রী মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদই পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঘুষ লেনদেনের সময় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী

www.pathagar.com

কমিটির সভাপতি ছিলেন। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের নীরবতা কি নিছকই ভুল, নাকি দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান থেকে তাদের সরে আসা, সে বিষয়ে বিএনপি নেত্রীর পরামর্শকরা ভেবে দেখতে পারেন।

মহাজোটের মতো একটি চরম ফ্যাসিবাদী সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সফল হওয়ার জন্য যে সাহস, একাগ্রতা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আবশ্যক, সেগুলো গত পৌনে চার বছরে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। আমার বিভিন্ন লেখায় অব্যাহতভাবে বিদেশি কূটনীতিকদের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে এসেছি। এ পর্যন্ত সেসব লেখালেখিতে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি। মাত্র দু'দিন আগে বেগম খালেদা জিয়া দিনাজপুরের জনসভায় সরকারের পেটোয়া বাহিনীর কামান-বন্দুককে পরাজিত করার কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। তিনি জনগণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, গণআন্দোলনের সামনে কোনো নির্যাতনই টিকে থাকতে পারে না।

বিরোধী নেত্রীর বক্তব্যের মর্মার্থ তার দলের নেতাকর্মীরা হৃদয়ঙ্গম করে অনুপ্রাণিত হলেই আন্দোলন সফল হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তবে মনে রাখা দরকার, জনদুর্ভোগে সাধারণ নাগরিকের পাশে দাঁড়াতে পারলে তবেই জনসম্পৃক্ততা বাড়বে, আন্দোলনও সফল হবে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করতে হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজপথে নামার কোনো বিকল্প নেই। আশা করি, পৌনে চার বছরের দুর্বলতা ও স্থবিরতা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীরাসহ সব দেশপ্রেমিক নাগরিক প্রস্তুত হয়ে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফেরিওয়ালাদের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক চেতনা হৃদয়ে লালন করেই পরাজিত করতে হবে।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমার পড়ন্ত বেলার শিক্ষক চলে গেলেন

গত বুধবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ৯টা বেজে ২৫ মিনিটে গরিব বাংলাদেশ আরও দরিদ্র হয়ে গেল। যশস্বী সাংবাদিক এবং খাঁটি সোনার মতো একজন মানুষ আতাউস সামাদ সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে গেছেন। সামাদ ভাইয়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর শোকাতুর স্বজনদের সেখানে রেখে যখন ভাঙা মন নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে কর্মস্থলে ফিরছিলাম, সহকর্মী হাসান হাফিজ আমাকে সামাদ ভাইয়ের স্মৃতিতে কিছু লিখতে বললেন। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় সবার আগে আমার দেশ কার্যালয়ে এসে কলম হাতে নিয়ে বার বার মনে প্রশ্ন জাগছে, এমন মানুষ সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা কী আমি আদৌ রাখি? কোথা থেকে শুরু করি?

আতাউস সামাদের সঙ্গে আমার চাক্ষুস পরিচয় সাত/আট বছরের অধিক হবে না। আমি তখন বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান। সাংবাদিক সুপন রায় সেই সময় এনটিভিতে কাজ করতেন। সাংবাদিকতা জগতে প্রবাদপ্রতিম আতাউস সামাদের সঙ্গে আমাকে একটা যৌথ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তিনি একদিন ফোনে আমন্ত্রণ জানালেন। অনুষ্ঠানটা একটু অন্য ধরনের। কোনো উপস্থাপক নেই, দু'জন অতিথি পরস্পরের সঙ্গে তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গল্প করবেন। আলাপচারিতায় আইডিয়াটা ভালো লাগলেও মহীরুহের মতো বিশাল এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠান করার দুশ্চিন্তা নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে সেদিন স্টুডিওতে হাজির হয়েছিলাম। অগাধ পাণ্ডিত্যের সামাদ ভাইয়ের শিশুর মতো সরল মনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছিল।

তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। মাঝে মধ্যে টেলিফোনে কথা হলেও সামনা-সামনি আর সাক্ষাৎ হয়নি। এর মধ্যে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সরকারে দায়িত্ব সাঙ্গ করে আমি ফিরে গেছি পারিবারিক ব্যবসা জীবনের ছোট পরিসরে। এর মধ্যে এক এগারোর বিভীষিকা এলো, অনেকটা আকস্মিকভাবে আমি নয়া দিগন্ত পত্রিকায় কলামিস্ট জীবন শুরু করলাম। এনটিভি এবং আমার দেশ পত্রিকার মালিক মোসাদ্দেক আলী ফালু অন্য অনেকের সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গেলেন। আমার দেশ পত্রিকা অফিসে

www.pathagar.com

রহস্যজনকভাবে আগুন লাগল। সামাদ ভাই প্রকৃত অভিভাবকের মতো মহাবিপদের মধ্যে পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সহকর্মীদের নিয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করছেন, সেটা দূর থেকে দেখে যাচ্ছিলাম।

২০০৮ সালের প্রথমদিকে একদিন আমার উত্তরার ভাড়া করা অফিসের ছোট্ট ঘরে বসে কাজ করছিলাম। অপারেটর বলল, আমার দেশ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক মহোদয় কথা বলবেন। আমি সোৎসাহে সংযোগ দিতে বললে ওপারে অনেক দিন পর সামাদ ভাইয়ের কণ্ঠ শুনলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার সময় চাইলেন। খানিকটা অবাক হয়ে পরদিনই সময় দিলাম। সামাদ ভাই আমার অফিসে এসে যে প্রস্তাব দিলেন, তার জন্য মানসিকভাবে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার দেশ আর বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না বলে তিনি পত্রিকাটির দায়িত্ব নিতে আমাকে অনুরোধ করলেন। সাংবাদিকরা বছরাধিককাল বেতন পাচ্ছেন না, কাগজ-কালি আর বাকিতে কেউ দিতে রাজি হচ্ছে না, এক বছর ধরে অফিস ভাড়া পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা অফিস ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। কারারুদ্ধ মোসাদ্দেক আলী ফালুর পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকা চালানোর টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। আমিও একজন ছোট ব্যবসায়ী। মধ্যবিত্তের স্তর অতিক্রম করতে পারিনি। এমন কোনো অর্থ-বিত্তের মালিক নই। কিন্তু আমার দেশ-এর সাংবাদিকরা কোনো কথা শুনতে রাজি নন।

মোসাদ্দেক আলীও কেবল ঋণের দায় নেয়ার বিপরীতে মালিকানা পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলেন। শেষ পর্যন্ত সামাদ ভাইয়ের অনুরোধ ফেলতে না পেরে জীবনের পড়ন্ত বেলায় প্রবেশ করলাম সংবাদপত্র জগতে।

নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও নতুন উদ্যমে আমার দেশ পরিচালনা করতে লাগলাম। পত্রিকায় আতাউস সামাদ শিক্ষক, আর আমি তাঁর শিক্ষানবিশ ছাত্র। তিনি তখন পুরোপুরি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। কোম্পানির দায়িত্ব নেয়ার মাস ছয়েক পর সামাদ ভাই তার নিজের এবং স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে আমাকে সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলেন। ততদিনে বুড়ো বয়সের ছাত্রের প্রতি হয়তো তাঁর আস্থা জন্মে গিয়েছিল। 'চান্স সম্পাদক' মাহমুদুর রহমানের জন্ম হলো। সামাদ ভাই পরিবারের অভিভাবক রূপে পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমাকে গ্রেফতার করা হলে আতাউস সামাদ তার শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে পত্রিকা সম্পাদনার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আমার দেশ পুনঃপ্রকাশ

www.pathagar.com

এবং আমার মুক্তির আন্দোলনে ৭৩ বছরের প্রবীণ বয়সে আবারও নব্বইয়ের গণআন্দোলনের বীর সেই বিবিসি'র আতাউস সামাদ রাজপথে নেমে এসেছেন, মিছিল করেছেন। প্রেস ক্লাব ও হাইকোর্টের সামনে মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় সহকর্মী ও কোম্পানির পরিচালক শাকিল ওয়াহেদ 'অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমান অকুতোভয় এক সম্পাদক' শিরোনামের লেখায় অফিসের একদিনের দৃশ্য এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন, 'অথচ তারই বিপরীতে দৈনিক আমার দেশ-এর আরেকজন ভূতপূর্ব সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদের অভিভাবকসুলভ ভূমিকা আমাদের আপ্লুত করেছে। সব সাংবাদিক-কর্মচারীর মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য নিয়মিত খোঁজখবর রাখাসহ সহানুভূতি প্রদর্শন করে এই কঠিন সময়ে তিনি আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন। যেদিন হাইকোর্টের রায়ে আমার দেশ পুনঃপ্রকাশ হবে বলে আমরা সবাই সন্ধ্যায় সদলবলে অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছি, সেদিনই সন্ধ্যার পরে হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের উপ-সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ কারোর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে বলতে যেন কাঁদছেন। আমি পাশে গিয়ে কী ব্যাপার জানতে চাইলে মোবাইলটি হাত দিয়ে ঢেকে মৃদুস্বরে বললেন, অন্যপ্রান্তে সামাদ ভাই কাঁদছেন। তিনি বলছেন যে, মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ-এর দায়িত্বে এনে এই বিপদে ফেলেছেন বলে তাঁর অপরাধবোধ হচ্ছে। আমি বাকশূন্য হয়ে বসে রইলাম। এই সহমর্মিতা ও মানবিক গুণাবলীর মূল্য কী দিয়ে পরিমাপ করা যায়, আমার জানা নেই।'

সামাদ ভাইয়ের ভালোবাসার ঋণ শোধ করব এমন ক্ষমতা কই আমার?

আর একটি ঘটনার কথা বলি। আদালত অবমাননা মামলায় সুপ্রিমকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সামনে দিনের পর দিন আমার বিচার চলছে। একদিকে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের সব আইনজীবীসহ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র। অন্যদিকে একাকী আমি, এক অসহায় কারাবন্দি। প্রধান বিচারপতি মো. ফজলুল করিম, আপিল বিভাগের বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এসকে সিনহা আমাকে বিদ্রূপ করে 'চান্স সম্পাদক' বিশেষণে অভিহিত করে তাচ্ছিল্য সহকারে আমার শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। সাংবাদিকতায় লেখাপড়া না করে এবং সাংবাদিকের চাকরি না করে আমার দেশ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হওয়ার ধৃষ্টতা দেখানোটাই মাই লর্ডশিপদের দৃষ্টিতে আমার 'অমার্জনীয়' অপরাধ। বিচারপতিরা আমার উদ্দেশ্যে অপমানসূচক মন্তব্য ছুঁড়ছেন আর সরকারি বেঞ্চের আইনজীবীরা হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। আমি প্রধান বিচারপতির হাতে একটা তালিকা দিয়ে বললাম, মানিক মিয়া, আবদুস সালামসহ এ দেশের বরেণ্য অনেক সম্পাদকই ভিন্ন পেশা থেকে সংবাদপত্র

www.pathagar.com

জগতে এসেছেন। আতাউস সামাদ সেদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। পরদিন আদালতের সব কথা শুনে তিনি আমার দেশ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদকে বলেছিলেন, মাহমুদুর রহমান বললেন না কেন যে তিনি আমার কাছ থেকে সাংবাদিকতায় শিক্ষা নিয়েছেন। জেলে থেকে তাঁর ছাত্রত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে আমার মনোবল দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

আমার প্রতি সরকারের যাবতীয় জুলুম, নির্যাতনের প্রতিবাদ করার অপরাধে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, কল্লামিস্টদের কাছ থেকে আতাউস সামাদকে অনেক কটু কথা ও মিথ্যা অপবাদ সইতে হয়েছে। লন্ডন প্রবাসী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তার লেখায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদ সম্পর্কে অব্যাহতভাবে নির্জলা মিথ্যাচার করেছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে তাঁর ছেলে আসেকুস সামাদ সন্তুকে আমি অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি, এ ধরনের ইঙ্গিত করে কলাম লিখতেও তার বিবেক পীড়িত হয়নি। অথচ সন্তুকে আমি গত সোমবার রাতে অ্যাপোলো হাসপাতালে তাঁর পিতার অস্ত্রোপচার চলাকালেই প্রথম দেখলাম। হাসপাতালের আলো-আঁধারিতে সাহসী, আদর্শবান বাবার গল্প বলার সময় গর্বিত পুত্রের চোখে-মুখে আলোর ছটা দেখে আপ্লুত হয়েছি। তাছাড়া বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান কাউকে অন্যায় সুবিধা দেয়ার যে কোনো সামর্থ্য রাখেন না, সে কথা সংস্থার বর্তমান নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. সামাদের কাছ থেকেও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জেনে নিতে পারতেন।

লন্ডন প্রবাসী অন্ধ আওয়ামী সমর্থক ও চরম সুবিধাবাদী ব্যক্তিটির মিথ্যা অপবাদে নরম মনের সামাদ ভাই বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু, রুচির এই দুর্ভিক্ষের দেশে আতাউস সামাদ এতটাই রুচিবান ছিলেন যে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নোংরা মিথ্যাচারের জবাব দিতেও তার রুচিতে বেধেছে। জানি না সামাদ ভাই চলে যাওয়ার পর অন্তত তার নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অপরাধে ক্ষমা চাইবার মতো সাহস সেই লোকটির আছে কিনা। আসলে যে ব্যক্তি যেমন চরিত্রের অধিকারী, সে অন্যকেও তেমনটাই ভাবে। সেই অতি ভোরে নদী তীরে গোসল করতে আসা চোর এবং সাধুর গল্প আর কি। বাংলাদেশের মতো বিভক্ত একটি দেশে আতাউস সামাদ সমস্তটা জীবন যেভাবে সকল প্রকার দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকতে পেরেছেন, তার দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোনো প্রলোভনই তাকে কখনও দুর্বল করতে পারেনি। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে আতাউস সামাদের উজ্জ্বল অবস্থান নিজেদের সৃষ্ট পাঁকের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে অনেক কষ্টে ঘাড় উঁচু করেই আগাচৌদের দেখতে হবে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'র মতো কালজয়ী গানটির স্রষ্টা না হলে তার স্থান কোন আস্তাকুঁড়ে কোথায় হতো, সে বিবেচনার ভার তার উপরই ছেড়ে দিলাম।

www.pathagar.com

আতাউস সামাদের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশে বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রিন্ট মিডিয়ার কার্পণ্য আমাকে ব্যথিত করেছে। যদি সংবাদ মাধ্যমই তাদের পেশার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের এভাবে অবহেলা করে, তাহলে সমাজের অন্য অংশ থেকে তারা সম্মান আশা করতে পারেন না। সাংবাদিক হিসেবে আতাউস সামাদ কোন মাপের ছিলেন সেটা তাঁর সহকর্মী, ছাত্র, শিক্ষকরা বিবেচনা করবেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর চেয়ে মহৎ কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য সংবাদপত্র জগতে অন্তত আমার আজ পর্যন্ত হয়নি। তিনি আধুনিক মনস্ক অথচ গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এ পার্থিব জীবনে তিনি যে অত্যন্ত সুখী ছিলেন, সে কথাটি অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে নিজেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বলে গেছেন। তার শোকাতুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। তার সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলেই প্রিয় শিক্ষকের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ইতি টানব।

আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন মিসেস আতাউস সামাদ আমার স্ত্রীকে ফোন করে নিয়মিত সান্ত্বনা দিতেন। এই মহীয়সী মহিলাও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখেন। সেই বিপদের সময় পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত এবং সূরার উল্লেখ করে তিনি আমার স্ত্রীকে পড়তে বলতেন। এখনও আমার পরিবারের বিভিন্ন আলাপচারিতায় প্রায়ই সে সব দিনের কথা উঠে আসে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই স্বামী হারানো এই নেককার বান্দাকে সবরের শক্তি দান করবেন। আতাউস সামাদের মৃত্যুর সঙ্গে আমার দেশ পরিবারেরও আত্মা চলে গেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে সামাদ ভাইয়ের শূন্যতা আমাদের পদে পদে দুর্বল করবে জেনেও বলছি, তাঁর মহান আদর্শ থেকে এই পত্রিকা কখনও বিচ্যুত হবে না। মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে এই অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন মানুষটির রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

জঙ্গিতত্ত্ব ফেরি করে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গত প্রায় দেড় দশক ধরে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। শেখ হাসিনা গত মেয়াদে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি অর্থব্যয়ে এদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান সম্পর্কিত পুস্তিকা ছাপিয়ে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ দূতাবাস মারফত বিতরণ করা হয়েছিল। এসব প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ২০০০ সালে বাংলাদেশ সফরে এলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় রাজধানীর পাশে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে যেতে পারেননি। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরও আওয়ামী লীগ সেই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিল।

আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাও দীর্ঘদিন ধরেই নানারকমভাবে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার রাষ্ট্রটি নিয়মিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সারা বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও উল্টো তারাই আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী জঙ্গিবাদী, সাম্প্রদায়িক ও অকার্যকর দেশ হিসেবে চিত্রিত করার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে থাকে। এদেশে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতম মিত্র আওয়ামী লীগ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ উপায় হিসেবে দিল্লির ব্যবহৃত কৌশলই যে পুনর্বার গ্রহণ করেছে, সেটা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে কারা প্রকৃত দায়ী, সে বিতর্কে না গিয়ে একথা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামবিদ্বেষ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন লাভের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতির ধারক-বাহকরূপে প্রচারণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার

www.pathagar.com

প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সর্বপ্রথম মাথাচাড়া দিলেও, অপরাধীদের দমনে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদের প্রথম দিকের সিদ্ধান্তহীনতা দ্বারা আওয়ামী লীগই উপকৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সাল থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে এদেশে নব্বইয়ের দশকে সৃষ্ট সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়া সম্ভব হয়।

আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও সংসদে সরকারদলীয় হুইপ মির্জা আজমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই ও তাদের সহযোগীদের বেগম খালেদা জিয়ার আমলেই গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। জেনারেল মইন ও ড. ফখরুদ্দীনের যৌথ নেতৃত্বাধীন ছদ্মবেশী সামরিক জান্তা পূর্ববর্তী সরকারের বিচার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ফাঁসি কার্যকর করে। তবে কিছু ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়া হলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি জেলায় প্রায় একই সময়ে এতগুলো বোমা স্থাপন এবং বিস্ফোরণ ঘটানোয় দেশি-বিদেশি মদতদাতা কারা ছিল? বোমার সরঞ্জাম কোন দেশ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল? জঙ্গিগোষ্ঠীর অর্থায়নের পেছনেই বা কারা ছিল? বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকার তাদের শাসনের প্রায় চার বছরে সেসব রহস্য উদঘাটনে কোনোরকম উৎসাহ না দেখিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অব্যাহতভাবে দেশে-বিদেশে জঙ্গিতত্ত্ব ফেরি করে চলেছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, ২০০৮ সালের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একচেটিয়া সমর্থন লাভে আওয়ামী লীগের এ-জাতীয় প্রচারণা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে গত পৌনে চার বছরের দুর্নীতি, জুলুম, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বাকস্বাধীনতা হরণসহ সার্বিক অপশাসনে গণবিচ্ছিন্ন মহাজোটকে তাই আবারও জঙ্গির গল্পেই ফিরে যেতে হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য ইসলামী জঙ্গিবাদের দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমাদের কাছে নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। শেখ হাসিনার বক্তৃতা দেয়ার সময় যে গুটিকয়েক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তারা বিএনপি-জামায়াতকে ঠিকমত না চিনলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার কল্যাণে জেনে গেলেন যে ষোলো কোটি মানুষের এই দেশটি জঙ্গিবাদের ঘাঁটি।

www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকারপ্রধান বিশ্বসভায় যখন নিজ দেশের প্রশংসা করেছেন, সে সময় শেখ হাসিনা দেশকে ডুবিয়ে কেবল নিজ পরিবারের গুণকীর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। তার বক্তৃতার মর্মার্থ হচ্ছে, বাংলাদেশে একমাত্র আওয়ামী লীগ এবং ব্যক্তিগতভাবে তার পক্ষেই ইসলামী জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুতরাং, তার সরকার অব্যাহতভাবে লুটপাট করে দেশের সর্বনাশ সাধন করলেও ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তাকেই সমর্থন করা আবশ্যক। ২০০৮ সালে অন্তরাল থেকে ভারত যেভাবে নানারকম প্রচারণা চালিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে শেখ হাসিনার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, একমাত্র তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো গেলেই গাজীপুরমার্কা নির্বাচনী তামাশার মাধ্যমে মহাজোটকে আরও অন্তত পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় রাখা সম্ভব হবে। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা দেয়ার দু'দিনের মধ্যেই এদেশে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের প্রাথমিক বাস্তবায়ন দেখা গেল।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কয়েকটি স্থানে যে চরম নিন্দনীয় সাম্প্রদায়িক অশান্তির সূত্রপাত হলো, তার পেছনে ক্ষমতাসীনদের কারসাজি এবং বিদেশি শক্তির উস্কানি সমভাবে দায়ী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শীর্ষপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের ইসলামবিরোধী বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ড দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গত পৌনে চার বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোরআন শরিফ এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননা করার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এক ব্যক্তি কোরআন শরিফ পরিবর্তনের আবদার নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করার ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখিয়েছে। এর মধ্যে সংবিধান সংশোধন করে 'আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস' সেখান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিউৎসাহী, আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের বোরকা পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কথিত জঙ্গি দমনের নামে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা, গুম, রিমান্ডে নির্যাতন, বিনাবিচারে কারাবাসের রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গোলাম মাওলা নামের এক শিক্ষককে সুপ্রিমকোর্ট জামিন দেয়ার পর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাশিমপুর কারাগারের ভেতরে ডিবি পুলিশের লোকজন প্রবেশ করে আত্মীয়-স্বজনের চোখের সামনে থেকে তাকে অজ্ঞাতবাসে নিয়ে গেছে। পাঁচদিন গোপন স্থানে রেখে নির্যাতন করায় সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি হলে বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আবারও রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী এই শিক্ষকের একমাত্র অপরাধ, তিনি নাকি হিযবুত তাহ্‌রির নামক একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কার্যকলাপ প্রধানত মার্কিন ও ভারতবিরোধী লিফলেট বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

হলেও বিদেশি প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে বর্তমান সরকারের আমলে তাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের বড় ছেলে অসুস্থ বর্ষীয়ান আলেম শাহ্ আহমদউল্লাহ্ আশরাফকেও অত্যন্ত অমানবিকভাবে সরকার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। ইসলামী জঙ্গি দমনের কথা বলেই সরকার এভাবে নির্বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে সরকার সমর্থক মাওলানাদের মিছিল করতে কোনো রকম বাধা দেয়ার পরিবর্তে রীতিমত পুলিশি নিরাপত্তায় তাদের কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হচ্ছে।

সরকারের কৌশল এখানে অতি পরিষ্কার। আলেমদের মধ্যকার একাংশকে সরকারের পক্ষভুক্ত করে ভিন্নমতাবলম্বীদের জঙ্গি আখ্যা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের নির্যাতন করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এভাবেই সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। পটিয়া ও রামুর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মহানবী (সা.)-কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিক্রিয়ায় সারা বিশ্বে যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে অবস্থায় ৯০ শতাংশ মুসলমানের আবাসস্থল, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণের ফেসবুকে আল্লাহ, কাবা শরিফ এবং কোরআন অবমাননাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। উত্তম কুমার বড়ুয়া নামের ওই তরুণ তার ধৃষ্টতার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা বুঝতে পারেনি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হওয়ার পর কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর কর্তৃক প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে ত্বরিত দোষারোপ করায় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য তার উপরিউক্ত মন্তব্য প্রদানের পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হতেই তিনি বায়বীয় মৌলবাদ এবং অসহায় রোহিঙ্গাদের ওপর এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হামলার দায় চাপানোর চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় এবং বাড়িঘরে প্রায় সারা রাত ধরে আক্রমণ চালানো হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নীরবতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং মৎস্যজীবী লীগের নেতাকর্মীরাই মূলত এই তাণ্ডব চালিয়েছে।

পৌনে চার বছরের মহাজোট সরকারের শাসন পদ্ধতি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

সংঘর্ষ অভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলেই সচেতন নাগরিকদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে কটূক্তি করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অনেক নাগরিকের বিরুদ্ধে রাতারাতি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেয়া হয়েছে। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণের চরম উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের আগেই দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য সরকার বিরোধী দলকে দায়ী করে যেভাবে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে সরকারের ভূমিকাই অধিকতর প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

বিএনপির কোনো রাজনীতিবিদ যদি এ ঘটনার জন্য প্রকৃতই দায়ী হয়ে থাকেন, তাহলে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জাতিকে জানিয়ে সেই ব্যক্তিকে সময়ক্ষেপণ ব্যতিরেকে আইনের হাতে সোপর্দ করা। কিন্তু তথ্যপ্রমাণবিহীন ঢালাও রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে সহিংসতা রোধে ব্যর্থতায় সরকারের দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ইতোমধ্যে ঘটনাকে ঘৃণ্য আখ্যায়িত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। বিএনপি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করার পাশাপাশি সত্য উদ্ঘাটনে দলীয়ভাবে আট সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। অনেকদিন পর এই একটি ইস্যু নিয়ে অন্তত দেশের প্রধান বিরোধী দল সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ গর্ব করার মতো ঐতিহ্যের অধিকারী। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৬৪ সালে মোনায়েম খান এবং ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের সরকার রাজনৈতিক ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করলে এদেশের প্রতিটি নাগরিক দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নাগরিকরা সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার ভোগ করে এসেছেন। লেখাপড়া কিংবা সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিতে ধর্মের কারণে কোনো নাগরিকের সুযোগ কখনও সংকুচিত করা হয়নি। সরকারের অনেক উচ্চপদে সংখ্যালঘুরা চাকরি করেছেন এবং করছেন। আমাদের প্রতিবেশী প্রায় সব রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা নানারকম নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বরাবর আমরা বাংলাদেশের উল্টো চিত্র দেখে এসেছি। মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা সেদেশে সাংবৎসরিক ঘটনা। কয়েক বছর পরপর ভারতে খ্রিস্টানরাও সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকেন। প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবীরের মতো বিচ্ছিন্ন কয়েকজন সংখ্যালঘু ভারতে উচ্চপদে আসীন হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অবস্থা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি চারজনে একজন মুসলমান হলেও সরকারি চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব শতকরা তিন ভাগেরও কম। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা বরাবরই নিগৃহীত। মিয়ানমারে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনে সামরিক জান্তা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী, শান্তিতে নোবেলপ্রাপ্ত অং সাং সু চির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। রামু ও পটিয়ার চরম নিন্দনীয় ঘটনা আমাদের অতি গর্বের সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আঘাত করেছে। যে বৌদ্ধ তরুণ ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং যে মুসলমানরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সহিংসতাকে বেছে নিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে ভেতরের রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

২০০৫ সালে ইসলামের নামে হঠকারী সংগঠন জেএমবি দেশব্যাপী যে বোমা হামলা সংঘটিত করেছিল, তার পেছনে দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সংযোগ ছিল বলে জনগণ দৃঢ়ভাবে সন্দেহ পোষণ করে। একইভাবে এবারের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উস্কানিতেও একই গোষ্ঠীর হাত থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বৌদ্ধধর্মীয় নেতা শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। হাজার বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। এটি অঘটন নয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।'

১৯৯১ সাল থেকে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ধারা অব্যাহত আছে, সেটি পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অধীনেই পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন করার অন্যায় ও অযৌক্তিক জিদ ধরে বসে আছেন। বর্তমান নির্বাচন কমিশন বজায় রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তার রূপটি কেমন হতে পারে, সেটি গাজীপুর-৪ আসনের সাম্প্রতিক নির্বাচনেই দেশবাসী বুঝে ফেলেছে। চাচা-ভাতিজির নিতান্তই পারিবারিক নির্বাচনটাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকেনি।

এই অভিজ্ঞতার পর বিএনপির অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি জনগণের কাছে আরও ন্যায্যতা পেয়েছে। এই বাস্তবতায় শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচন একমাত্র ভারত ছাড়া বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রেরই মেনে নেয়ার কথা নয়। তাই বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করতেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্যোগ নেয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এটা যদি দেশি বা বিদেশি কোনো ফাঁদ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা যাতে সেই ফাঁদে পা না দিই, সে ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আবেদন জানাই। এ ধরনের

www.pathagar.com

উস্কানিমূলক ঘটনা আবারও ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হলে, তার প্রতিবাদ হতে পারে। তবে সেটি অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ে যারা ভাংচুর চালিয়েছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে দ্রুত সাজা দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

তবে সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু মিডিয়ার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা লক্ষ্য করে শঙ্কিত হচ্ছি। মৌলবাদের নামে আলেমদের কিংবা স্বদেশে সংখ্যাগুরু শাসকদের হাতে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বলির পাঁঠা বানানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সব সচেতন অসাম্প্রদায়িক নাগরিকের কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। যেসব মিডিয়া কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই রামুর ঘটনায় রোহিঙ্গাদের দোষারোপ করছেন, তারা মিয়ানমারে যখন অসহায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন নীরবই ছিলেন। বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠী নিগৃহীত হলে যে শ্রেণী চুপ করে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অথবা দুঃখবোধ করে না, তারাও অবশ্যই ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। এদের মন্দ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রা.) একটি কাহিনী বর্ণনা করে এই মন্তব্য প্রতিবেদন সমাপ্ত করব।

মুসলমান বাহিনীর জেরুজালেম বিজয়ের পর খলিফা ওমর (রা.) সুদূর মদিনা থেকে সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমান–তিন ধর্মাবলম্বীদের কাছেই জেরুজালেম অত্যন্ত পবিত্র নগরী। তিনি সেখানে পৌঁছানোর পর হজরত ঈসা (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত একটি গির্জা ঘুরে দেখছিলেন। এমন সময় নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে হজরত ওমর (রা.) গির্জার বাইরে এসে নামাজ পড়তে চাইলেন। গির্জার পাদ্রীরা খলিফাকে গির্জার ভেতরেই নামাজ পড়ার অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, আমি খলিফা হয়ে আজ এখানে নামাজ পড়লে সব মুসলমানই এটাকে নামাজের স্থান বানিয়ে ফেলবে। তাতে দেখা যাবে আপনাদের গির্জা মুসলমানের মসজিদে পরিণত হয়েছে। একজন মুমিন মুসলমানের অন্য ধর্মের উপাসনালয়কে কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য, সেদিন হজরত ওমর (রা.) আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

শুধু তা-ই নয়, খ্রিস্টান শাসকদের দীর্ঘদিনের অবহেলায় ইহুদিদের উপাসনার স্থানে যে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছিল, খলিফা ওমর (রা.) সেই আবর্জনা

www.pathagar.com

স্বহস্তে পরিষ্কার করেছিলেন। ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এর চেয়ে মহৎ নজির বিশ্ব ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ ধর্মরক্ষার নামে যারা বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দিয়েছে, ভাংচুর করেছে, তাদের আর যা-ই হোক, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুসারী বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন পন্থায় ও কৌশলে আগ্রাসন চালাচ্ছে। দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়া হলে বাংলাদেশে কাছের ও দূরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন পরিচালনার নতুন ছল-ছুতা সৃষ্টি হবে। ইরাক, আফগানিস্তান এবং লিবিয়ার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের এদেশীয় দালাল শ্রেণীকে প্রতিরোধ করে দেশপ্রেম ও প্রকৃত ঈমানের পরিচয় দেয়ার আহ্বান জানাই।

৩ অক্টোবর ২০১২

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক শাসনের বিকল্প নেই

বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অক্টোবরে আমাদের দুই প্রবল ক্ষমতাধর প্রতিবেশী রাষ্ট্র সফর করে দেশে ফিরেছেন। অন্য বিষয়াদির মতোই বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের দুই প্রধান নেত্রীর চরিত্রে লক্ষণীয় ভিন্নতা রয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বরাবরই বিদেশে বেড়াতে বিশেষ পছন্দ করেন। তার সকল নিকট-জনেরাও সপরিবারে প্রবাসী। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে দুর্নীতির ব্যাপকতা নিয়ে চারদিকে গুঞ্জন ওঠার প্রেক্ষিতে কয়েক মাস আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পরিবারের সংজ্ঞা দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। সেই সংজ্ঞায় তিনি ছাড়া তার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং উভয়ের পুত্র-কন্যাগণ কেবল প্রধানমন্ত্রীর পরিবারভুক্ত। পুত্রবধূ অথবা কন্যা-জামাতা এবং পৌত্র-পৌত্রীদের এই সংজ্ঞায় স্থান কোথায়, সে বিষয়ে শেখ হাসিনা অবশ্য কিছু বলেননি।

যাই হোক, এরা সবাই আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনের বাসিন্দা। পদ্মা সেতু দুর্নীতির দেশে-বিদেশে তদন্তের প্রেক্ষিতে তিন দেশের মধ্যে সম্প্রতি কানাডা নিয়েই মিডিয়া ও জনগণের ঔৎসুক্য বিশেষভাবে বেড়েছে। সুতরাং, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণপ্রীতির পেছনে ন্যায্য কারণ রয়েছে। অপরদিকে আগের ইতিহাসে দেখা গেছে, বেগম খালেদা জিয়া স্বদেশে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পাঁচ বছরের সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও দেখেছি, তিনি নিজে যেমন বিদেশে যেতে চান না, একইভাবে মন্ত্রী-আমলাদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণের প্রবণতাকেও যথেষ্ট অপছন্দ করেন। রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত কারণে বিরোধীদলীয় নেত্রীর দুই পুত্র বিগত চার বছরেরও অধিককাল বিদেশে থাকলেও তিনি কিন্তু পরিবার থেকে দূরে থাকার যাতনা সয়ে অধিকাংশ সময় বাংলাদেশেই কাটিয়েছেন।

বেগম খালেদা জিয়া দশ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে প্রায় নয় বছর পার করেছেন এবং এবারের মেয়াদ পূর্ণ করে তিনিও বেগম খালেদা জিয়ার ১০ বছরের রেকর্ড ধরে ফেলবেন বলেই সকলের ধারণা। মাঝখানের দুই বছরের মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের

www.pathagar.com

সরকারের সময়টুকু বাদ দিলে দুই নেত্রী দুই দশক ধরে পালাক্রমে সরকারপ্রধান এবং বিরোধীদলীয় প্রধান হয়েছেন। এই সময়ের বিদেশ ভ্রমণের তালিকা প্রণয়ন করলে একজনের বিদেশ ভ্রমণপ্রীতি এবং অপরজনের বিদেশ যেতে অনীহার চিত্রটি জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠবে। ক্ষমতাবানদের বেড়ানোর গল্প রেখে এবার রাজনীতির গুরু-গম্ভীর আলোচনায় আসি।

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হতে সংবিধান অনুসারে এখনও এক বছরেরও কিছু অধিক সময় বাকি আছে। জনগণ গভীর আশঙ্কা নিয়ে আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেশব্যাপী এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির তাবৎ 'কৃতিত্ব' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ভাগাভাগি করে নিতে পারেন। উভয়ে মিলে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রথা বাতিল না করলে এই অনভিপ্রেত অস্বস্তির সৃষ্টি হতো না। তবে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল না হলেও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান কে হচ্ছেন, সেটা নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে ২০০৬ সালের মতো একটা টানাপড়েন যে থাকতো, সেটা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ অপরিবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকই আজ সেই পদের দাবিদার হতেন। ২০০৬ সালে বিচারপতি কেএম হাসানকে সত্তরের দশকে তার সঙ্গে বিএনপির কথিত সাংগঠনিক সম্পর্ক এবং কর্নেল রশীদের সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেনি।

তদুপরি ২০০৫ সালে চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স ২ (দুই) বছর বাড়ানোর বিষয়টিকে তৎকালীন বিরোধী দল সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখেছে। কিন্তু একজন বিচারপতি হিসেবে কেএম হাসান প্রজ্ঞা, নিরপেক্ষতা, সততা এবং আইনের গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত আচরণ সর্বদাই বিচারপতিসুলভ ছিল। দীর্ঘ জজিয়তি জীবনে তিনি যে সকল রায় লিখেছেন, সেগুলো নিয়ে কখনোই কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। অপরদিকে বিচারপতি খায়রুল হক আদালতপাড়ায় একজন চরম দলবাজ বিচারপতি হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষয়টি সম্পর্কেও দেশবাসী অবহিত। কাজেই বিচারপতি খায়রুল হককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে মেনে নেয়া বিএনপি'র পক্ষে সঙ্গত কারণেই সম্ভব হতো না। মনে রাখা দরকার, এই ধরনের জটিলতা থেকে উত্তরণের পন্থা ত্রয়োদশ সংশোধনীতেই দেয়া ছিল।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৫৮গ (৫)-এ বলা ছিল–

www.pathagar.com

"যদি আপীল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে, রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।"

এক-এগারোর সরকার গঠনের সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ছাড়াই শুধু সামরিক জান্তার নির্দেশে ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার এই পদক্ষেপ সরাসরি সংবিধানের লঙ্ঘন হলেও সে সময় সুশীল (?) সমাজভুক্ত আইনজীবীকুল এবং শেখ হাসিনাসহ মহাজোট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি। যাই হোক, দেশের বর্তমান বিবদমান পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি রাজনৈতিক সংঘাত থেকে হয়তো জনগণকে মুক্তি দিতে পারত। কিন্তু একতরফাভাবে প্রায় অকার্যকর, একদলীয় সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান পদে নিযুক্তির সুযোগ রহিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বছর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবর্তে প্রধান দুই দল এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আন্দোলন পরিচালনা এবং আন্দোলন প্রতিহত করার কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

বিগত চার বছরে বিএনপি বিভিন্ন ইস্যুতে থেমে থেমে আন্দোলনের হুঙ্কার দিলেও তেমন কোনো সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বরং আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থকও হয়তো স্বীকার করবেন যে, ১৯৯১-পরবর্তী বাংলাদেশের বিগত চারটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মেয়াদকালে রাজপথের আন্দোলনের বিবেচনায় এবারই কোনো সরকার তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে চলেছে। এখন পর্যন্ত জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক কর্মসূচি হরতাল দেয়াতে বিএনপি'র নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পরিষ্কার অনীহা লক্ষ্য করা গেছে। বিএনপিবিরোধীরা বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে অবশ্যই দাবি করতে পারেন যে, বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সরকারের কঠোর পুলিশি ব্যবস্থার কারণেই দেশের রাজনীতি শান্তিপূর্ণ থেকেছে।

যে কারণেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই আপাতঃ উত্তরণ ঘটে থাকুক না কেন, বাস্তবতা হলো মহাজোট সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ চার বছর

www.pathagar.com

সময় পেয়েও চরম দলীয়করণ, নজিরবিহীন দুর্নীতি ও তীব্র প্রতিহিংসা পরায়ণতার কারণে দেশ পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের বিদেশি মরুব্বি গোষ্ঠীও বাংলাদেশে জনমতের পরিবর্তন সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পেরে তাদের কৌশলেও পরিবর্তন এনেছে। তাদের সেই পরিবর্তনে এদেশের শাসকগোষ্ঠীও যে বিচলিত হয়ে পড়ছে, সেটাও বেগম জিয়ার সাম্প্রতিক ভারত সফর নিয়ে নেতৃবৃন্দের অকূটনৈতিক মন্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

এ অবস্থায় নির্বাচনে পরাজয়-পরবর্তী অবধারিত জনরোষ থেকে রক্ষা পেতেই ক্ষমতাসীন মহল ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার আয়োজন করছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে এই সর্বনাশা খেলা থেকে তাদের অবশ্যই নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ১৯৭৫ সালে সংবিধান সংশোধনের ফলাফল আওয়ামী লীগের জন্য হৃদয়বিদারক হয়েছিল। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে দুই দফায় একতরফা নির্বাচন করলেও কোনো বারই সংসদের মেয়াদ দুই বছরের বেশি টেকাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাকে গণধিকৃত হয়ে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংযুক্তির জন্যই করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই স্বল্পকালীন সংসদের মেয়াদও তাই ত্রয়োদশ সংশোধনী গ্রহণের সঙ্গেই সমাপ্ত হয়েছিল।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি বিএনপি'র একতরফা নির্বাচন প্রচেষ্টার বিপজ্জনক পথ ধরেই জেনারেল মইন-মাসুদ গং ক্ষমতা দখল করেছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে তারাও আজকের মহাজোটের মতোই নব্বই দিনের মেয়াদের কথা ভুলে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তথাকথিত 'মাইনাস টু' সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল। বাংলাদেশের সুশীল (?) সমাজ তৎকালীন অসাংবিধানিক সরকারকে শুধু সমর্থনই জানায়নি, 'মাইনাস টু' বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। সে সময় 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা : প্রচারণা ও বাস্তবতা' শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলাম। ২০০৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত কলামের এক জায়গায় শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে লিখেছিলাম– "বাস্তবতা হলো, এই দুই নেত্রী মিলে দীর্ঘ ১৫ বছর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীরূপে বাংলাদেশ পরিচালনা করেছেন এবং কারাবন্দী অবস্থাতেও এই দু'জনই বাংলাদেশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারার রাজনীতির অবিসংবাদিত নেত্রীর স্থানটি ধরে রেখেছেন। বর্তমান নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কেউ হয়তো এমন ধারণা পোষণ করেন যে, জননন্দিত নেতা চাইলেই পাওয়া যায় অথবা হওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি এতটা সহজ হলে তথাকথিত মাইনাস টু কৌশল এতদিনে বাস্তবায়ন হয়ে যেত।"

www.pathagar.com

২০০৮ সালের মাঝামাঝি দুই নেত্রী সংসদ এলাকার সাবজেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তবে দুই মুক্তিতে অনেক ফারাক ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন সামরিক জান্তার সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের বন্দোবস্ত সমাপ্তি সাপেক্ষেই জেলের বাইরে পা রেখেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ সেই অশুভ আঁতাত নিয়ে তখন লিখেছিলাম, 'আঁতাতকারীরা ক্ষমতার পিঠা ভাগে মত্ত।' ওই বছর জুলাইয়ের ১৭ তারিখে নয়া দিগন্তে প্রকাশিত সেই লেখায় আমার মন্তব্য ছিল–

"বর্তমান ক্ষমতাসীনদের সাথে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর মাখামাখি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শেখ হাসিনা কারামুক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে এখন বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন এবং সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের একপ্রস্থ সংলাপ নাটকও সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এক-এগারোর অন্যতম রূপকার ও প্রচ্ছন্নের ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির প্রশংসায় ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। অপরদিকে এই সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের নিপীড়ন তীব্রতর হয়েছে।"

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য মন্ত্রীর জাতিকে এক-এগারোর ভয় দেখানোর প্রেক্ষিতেই পাঠকদের পুরনো কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। তাদের স্মরণে রাখা আবশ্যক, এক-এগারো আওয়ামী লীগ ও সুশীল (?) গোষ্ঠীর যৌথ প্রকল্প ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সেই এক-এগারোর আঁতাতেরই ফসল। এটাই প্রকৃত ইতিহাস। সুতরাং, এক-এগারো সম্পর্কে সমালোচনার নৈতিক অধিকার বাংলাদেশের আর যে নাগরিকই হোক, অন্তত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাখেন না। ফখরুদ্দীন আহমদের শপথ গ্রহণের দিনে বঙ্গভবনে দলবলসহ তার সহর্ষ উপস্থিতি এবং সেই সরকারের 'সকল কর্মকাণ্ডের' আগাম বৈধতা প্রদানের ঘোষণার কথা ভুলো বাঙালি মুসলমান বোধহয় এখনও পুরোপুরি ভুলে যায়নি।

তাছাড়া সেই ক্যু দেতা'র অন্যতম নায়ক লে. জে. (অব.) মাসুদউদ্দিন চৌধুরী চাকরিতে একের পর এক মেয়াদ বৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি করে আজ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাকে এই নজিরবিহীন পুরস্কার প্রদানের পেছনে যে শেখ হাসিনার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধের ব্যাপারটি ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেটি দেশের সকল সচেতন নাগরিকই বুঝতে পারেন। এক-এগারোর সরকার দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর মইন-মাসুদকে লক্ষ্য করে যতই হুংকার ছাড়ুন না কেন, তার যে দুই সাবেক জেনারেলের কেশাগ্র স্পর্শ করারও ক্ষমতা নেই, এটা

www.pathagar.com

সম্ভবত তিনিও জানেন। তবু চেঁচামেচি করে গায়ের ঝাল যদি কিছুটা কমানো যায় আর কী!

বেগম খালেদা জিয়ার সদ্যসমাপ্ত ভারত সফরের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সহসাই জোর নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করবে বলেই মনে হচ্ছে। সংবিধানের বর্তমান অবস্থায় দশম সংসদ নির্বাচন আগামী বছর অক্টোবরের ২৫ থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারির ২৪-এর মধ্যবর্তী যে কোনো দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সাবেক প্রধান বিচারপতি ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রায়ে আবার কমপক্ষে ৪২ দিনের নির্বাচন প্রস্তুতির একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। রায়ের ওই অংশটি বিবেচনায় নিলে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০৮ সালেও ওই মাসেই নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাসে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে খানিকটা অতিরিক্ত উদ্দীপনা বিরাজ করে। দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনাও নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এগিয়ে থাকার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিশ্চয়ই বিবেচনায় নেবেন। সব মিলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার বিষয়টি এখন সর্বতোভাবে শেখ হাসিনার ওপরই নির্ভর করছে।

গণআকাঙ্ক্ষা মান্য করে তিনি একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি দেশও এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। ১৯৯৬ সালের বিএনপির মতো বর্তমান সংসদে মহাজোটের সংসদ সদস্যের সংখ্যা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সে সময় সংসদে বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার কারণেই বেগম খালেদা জিয়াকে ১৫ ফেব্রুয়ারির অজনপ্রিয় নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় শেষ হাসিনার ইচ্ছানুযায়ী সংবিধানে যে কোনো সংশোধনী আনার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার দলের রয়েছে। তার সরকারের মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আইনগতভাবে বৈধ এবং নৈতিকভাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

কিন্তু মেয়াদ শেষে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে শেখ হাসিনা যদি দশম সংসদের একতরফা নির্বাচন সম্পন্ন করতেও পারেন, তাহলেও তাকে আর বৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশে-বিদেশে কেউ মেনে নেবে না। সেক্ষেত্রে কেবল পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করেই তাকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের ৪১ বছরের ইতিহাসে সকল অত্যাচারী শাসকের ভয়ানক পরিণতি ঘটেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবেও বর্তমান সরকার ক্রমেই বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে। শেষ ভরসা ভারতীয় দুর্গতেও বেগম খালেদা জিয়া জোরেশোরে হানা

www.pathagar.com

দিয়েছেন। সুতরাং কেবল এক ইসলামী জঙ্গি জুজুর ভয় দেখিয়ে ২০০৮-এর মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতকে একসঙ্গে পাশে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন মহলের যে কোনো মূল্যে ২০২১ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার ফ্যাসিবাদী চিন্তাই বরং আবারও অসাংবিধানিক শক্তির ক্ষমতা দখলের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

২০০৭ সালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সমগ্র জাতিকেই শেষ পর্যন্ত এ ধরনের বোধবুদ্ধিহীন দুঃসাহসিকতার মূল্য চুকাতে হয়। মইন-মাসুদ গংয়ের তুঘলকি রাজত্ব-পরবর্তী পাঁচ বছরে সেনাবাহিনী এবং বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা দুর্বল হয়েছে। দলগুলোর সংকীর্ণ ক্ষমতার রাজনীতি চর্চা বাংলাদেশকে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের স্বার্থে স্বাধীনতাকামী জনগণের ঐক্য প্রয়োজন। গণতন্ত্রের অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে অন্তত জাতীয় ইস্যুতে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক শাসন অপরিহার্য। আশা করি, শেখ হাসিনা উপলব্ধি করবেন, অসাংবিধানিক সরকারের আগমনী পথ প্রশস্ত করার চাইতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিরোধী নেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করাও অধিকতর নিরাপদ ও সম্মানজনক। ২০০৮ সালে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে জনসমর্থনের বিচারে বেগম খালেদা জিয়ার অবিশ্বাস্য ঘুরে দাঁড়ানো থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন।

৭ নভেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

9 789840 418138